মীরার

করকমলে :—

শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু

চৈত্র—১৩৪২

All rights reserved by the Author.

মূল্য—একটাকা চার আনা

অপলাষিকা

—এক—

ইন্দ্রনাথ সাধুপুরুষ। অর্দ্ধ চন্দ্রাকার শুভ্র ললাট, কমনীয় মুখ, ঘন কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশ-পাশ যে-অপরূপ শোভা বিকীর্ণ করিত, তাহা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারিত না। দীর্ঘ, ঋজু দেহ—সবল এবং সুন্দর। দেখিয়া মনে হয়—দেবতার আশীর্ব্বাদ তাঁহার উপর পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পড়িয়াছে।

আশ্রমের নাম—অমরাবতী। আয়তনে ইহা খুব বড়ো না হইলেও ছোটো বলা যায় না। ইহার অদূর-দক্ষিণে যে-শ্যামল ক্ষেত্র নিঃসাড়ে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার শোভার সহিত যেনো এই আশ্রমটির বাহিরের এবং ভিতরের সৌন্দর্য্যের অনেক স্থলে সাদৃশ্য আছে।

ইন্দ্রনাথ এই আশ্রমের মাথা। কাক-পক্ষী ডাকিবার পূর্ব্বেই শয্যা ত্যাগ করা তাঁহার স্বভাব। পুষ্করিণীর স্বচ্ছজলে স্নান করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলে, পূজায় বসেন। এবং পূজা সারিয়া

—না, আগে ঝড়-বৃষ্টি থামুক্ ; তারপর যাবে।

—যদি আজ নাই থামে ? তবে কি আমার যাওয়া হবে না ?

—নাই বা হ'লো, বাবা !

—কিন্তু আমি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আজ তোর জন্যে কি ওর অপমান ক'র্‌বো রে ?

ইহার উত্তরে শিপ্রা যেনো কি বলিতে যাইতে ছিল। কিন্তু মুখ হইতে কথা বাহির হইবার পূর্ব্বেই কাছাকাছি কোথায় বোধকরি বজ্রাঘাত হইল। সেই শব্দে শিপ্রা ইন্দ্রনাথের গায়ের নামাবলি খানার একাংশ বাঁ হাত দিয়া চাপিয়া, তাঁহাকে ঘরের দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল।

—ভয় পেয়েছিস্, শিপ্রা ? হ্যাঁ রে ?

—নিজের জন্যে নয়, বাবা।

শিপ্রা হইতে মুখ ফিরাইয়া ইন্দ্রনাথ কহিলেন, আচ্ছা, চল্।

সন্ধ্যা আসিয়া পৃথিবীতে নামিয়াছে। অমরাবতী-আশ্রমের ভিতরে আলো জ্বালিয়া দিয়াছে—অন্যান্য মেয়েরা। ইন্দ্রনাথ মেঝের উপরে একখানা আসন পাতিয়া বসিয়া ছিলেন। শিপ্রা সান্ধ্য-ক্রিয়া সারিয়া ফিরিয়া আসিল, বলিল, তোমার পূজোর আয়োজন ক'রে দোবো, বাবা ?

দে। বলিয়া ইন্দ্রনাথ চক্ষু বুজিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

রাত্রে আশ্রমের দেবীর আরতির পর ইন্দ্রনাথ বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, ঝড় কমিয়াছে বটে ; কিন্তু বৃষ্টি থামে নাই। গায়ের নামাবলি খানা খুলিয়া রাখিয়া ছিলেন। এখন নিজের ঘরে

ফিরিয়া গিয়া, গায়ে দিলেন। শিপ্রা আশ্রমের কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল। ইন্দ্রনাথ সেই সুযোগে নিঃশব্দে আশ্রমের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গান-বাজ্‌নার সখ তাঁহার নিরতিশয়। যেমন ভালো গাহিতে পারেন, তেমনি ভালো গায়কের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন। জল-ঝড় সহ্য করা তাঁহার বহুদিনের অভ্যাস। এখন ইহাতে কষ্ট হয় না।

নিভৃত পল্লীর মেঠো পথ নহে। তবু পথের স্থানে-স্থানে জল জমিয়াছে। কাদাও হইয়াছে। ইন্দ্রনাথের নগ্নপদ ইহাতে বিশেষ ক্লেশ বা বাধা অনুভব করিল না।

—অমরাবতী-আশ্রম আর কতো দূর ব'ল্‌তে পারেন?

ইন্দ্রনাথের পদদ্বয়ের গতি হ্রাস হইতে আরো হ্রাস হইয়া আসিল। পথের উপর দাঁড়াইয়া, ঘাড় ফিরাইয়া অপর্য্যাপ্ত আলোকেও দেখিতে পাইলেন—একটি নারীকে। এই নারীটির সমস্ত অবয়ব একখানা শ্বেতবর্ণের চাদরে আবৃত। অবগুণ্ঠনহীন মুখ দেখিয়া ইন্দ্রনাথের সহজেই বিশ্বাস হইল, এই মেয়েটি অপূর্ব্ব সুন্দরী।

—অমরাবতী-আশ্রম? এখান থেকে বেশীদূর নয়। মিনিট্ কতোকের পথ। কিন্তু প্রয়োজন?

—প্রয়োজন আছে। আপনি পথিক, সে-কথা আপনাকে খুলে বলা যায় না।

মেয়েটির স্বরে একটা দৃঢ়তার রেশ ছিল। ইন্দ্রনাথের কানে সেটা ধরা পড়িতে দেরী হইল না। কহিলেন, আমিই সেই আশ্রমের কর্ত্তা!

সেই অপরিষ্কার পথের উপর মেয়েটি সহসা নতজানু হইয়া বসিয়া পরক্ষণেই ইন্দ্রনাথের পদদ্বয়ের ধূলি মাথায় তুলিয়া লইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দ্রনাথ বিচলিত হইলেন না। তাহাকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, তোমাকে পথ ব'লে দিচ্ছি। সোজা গিয়ে বাঁ দিকে ফির্‌লেই একটা পুষ্করিণী দেখ্‌তে পাবে। এর-ই হাত সাত-আট দূরে অমরাবতী-আশ্রম। চিনে নিতে বোধকরি তোমার দেরী হবেনা।

এই বলিয়া তিনি গমনোদ্যত হইলেন।

মেয়েটি ইন্দ্রনাথের গমনপথে বাধা দিয়া বলিল, আপনি যখন দয়া ক'রে নিজের পরিচয় আমাকে দিয়েছেন, তখন আশ্রমেও আমাকে নিয়ে যেতে হবে। ক্ষিধেয় এবং তেষ্টায় আমার সমস্ত শরীর অবশ হ'য়ে এসেছে। আপনার আশ্রমে আমি আশ্রয় চাই।

বলিয়াই সে ইন্দ্রনাথের মুখের উপর করুণ দৃষ্টিতে চাহিল।

মাথার উপরে জলীয় মেঘটা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। ইন্দ্রনাথ আকাশের পানে চোখ্‌ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন—আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে এবং ইহার-ই এক কোণে চাঁদের গোলাকার পূর্ণ-মূর্ত্তিটা সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইবার উপক্রম করিতেছে।

তিনি দৃষ্টি নত করিলেন। মেয়েটির আর্দ্রবস্ত্র হইতে তখনো ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পথের উপর পড়িতে ছিল। ইন্দ্রনাথ কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে কি চিন্তা করিয়া কহিলেন, আচ্ছা, এসো!

—দুই—

মেয়েটির নাম,—কল্পনা। সিক্ত-বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া সে শিপ্রার পাশে আসিয়া বসিয়া ছিল। কহিল, আমি কে জানো না তো, ভাই?

—তুমি আমাদেরই মতো একজন মানুষ। আশ্রমে থাক্‌তে চাও। এর বেশী কি ক'রে জান্‌বো? আমরা তো আর হাত গুণ্‌তে জানি নে!

—জানোনা? আমার ধারণা ছিল, তোমরা শুধু হাত গুণ্‌তে কেন, মানুষের মুখ দেখ্‌লেই ব'লে দিতে পারো, তার সমস্ত গত-জীবনের কাহিনী।

ইন্দ্রনাথ একপার্শ্বে চুপ্‌ করিয়া বসিয়া ছিলেন। কহিলেন, হাত গুণ্‌তে জানাটা সবচেয়ে বড়ো জানা নয়, কল্পনা। মুখ দেখে যে-লোক অন্যের গত-জীবনের কাহিনী ব'ল্‌তে পারে ব'লে গর্ব্ব করে, তার চেয়ে বড়ো ভণ্ড আর নেই।

কল্পনা ক্ষণকাল বাহিরের অন্ধকারে অনির্দ্দিষ্ট-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, এর মানে তো ভালো বুঝ্‌তে পার্‌লুম না!

শুনিয়া ইন্দ্রনাথ হাস্য-মুখে পুনর্ব্বার কহিলেন, সংসারে এমন লোকের অভাব নেই, যারা মুখের 'পর সর্ব্বদাই প্রসন্নতার মুখোস প'রে চলাফেরা করে। তাদের গত জীবনে যে দুঃখের ও অপবিত্রতার ঢেউ ব'হে গেছে, এ তারা কোনো মতেই বাইরে

প্রকাশ ক'র্‌তে চায় না। এ-ক্ষেত্রে কী ক'রে সম্ভব হবে, তাদের মুখ দেখে বিচার করা—পূর্ব্বে তারা কি ছিল ?

কল্পনা বোধহয় কথাটার অর্থ বুঝিল। এবং বুঝিল বলিয়াই নিজের দিক দিয়া বিচার করিয়া ইহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতে পারিল না। কক্ষে-স্থিত প্রদীপের যে-আলোকে ইন্দ্রনাথের মুখের এক পাশ দেখা যাইতে ছিল, সেই দিকে চাহিয়া বলিল, কিন্তু আমার মুখের 'পর কি প্রসন্নতার মুখোস পরা আছে ? দুঃখ এবং অপবিত্রতা, দু'টোই আমার মনের মধ্যে তুমুল ঝড় তুলেছে। কিন্তু এদের কি মিথ্যা প্রবঞ্চনা ঢেকে রাখ্‌তে পেরেছে ? দেখুন্ তো আমার মুখখানা একবার ভালো ক'রে—কোথায়ও হৃদয়ের গভীর ব্যথা সুস্পষ্ট হ'য়ে আছে কি না !

কল্পনার কণ্ঠ-স্বর ভারী হইয়া আসিয়া ছিল তাহার কথার শেষ দিকটায়। এটুকু ইন্দ্রনাথের কানে ধরা পড়িল। তিনি কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পূর্ব্বের ন্যায় শান্ত স্বরেই কহিলেন, তোমার সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট ক'রে কোনো কথা আমি ব'লিনি কল্পনা ! ব'লেছি সাধারণ ভাবে। যা' আমরা সচরাচর দেখ্‌তে পাই। কিন্তু তুমি তাদের বাইরে—এ আমি জানি।

কল্পনা দুই, তিন মিনিট্ মুখ নত করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। এই নিস্তব্ধতার মাঝ্‌খানে শিপ্রা এক সময়ে ইন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, বাবা, তুমি যে ব'লে ছিলে কল্পনাদি'র খাবারের আয়োজন ক'র্‌তে! দেখেছো, আমি এ-কথা একেবারেই ভুলে গেছলুম !

এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ইন্দ্রনাথ কথা বলিবার পূর্ব্বেই কল্পনা মুখ তুলিয়া শিপ্রার দিকে চাহিল, বলিল, আমার জন্যে অতো ব্যস্ত হ'চ্ছো কেন? মানুষের খাওয়াটাই তো আর সবচেয়ে বড়ো ধর্ম্ম নয়!

এ-কথায় শিপ্রা প্রবল আপত্তি তুলিল; কহিল, খাওয়াটাই সবচেয়ে বড়ো দরকার। কেননা, পেটে ক্ষিধে রেখে কোনো ধর্ম্ম হয় না। আত্মাকে কষ্ট দেওয়া ধর্ম্মের আসল উদ্দেশ্য নয়।

শুনিয়া কল্পনার বিস্ময় জাগিল। এতোটুকু মেয়ে। কথায় অনেক বড়ো।

শিপ্রা আহার্য্য আনিতে অন্য কক্ষে চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে ইন্দ্রনাথ প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি জীবনে খুব বড়ো ব্যথা পেয়েছো, কল্পনা?

—আমার জীবনের কাহিনী শুন্‌লে আপনি এর সঠিক্ উত্তর পাবেন। কিন্তু সে-কাহিনী আপনার পবিত্র মনে কলুষের ছায়া টেনে দিয়ে যাবে।

ইন্দ্রনাথ কল্পনার মুখের দিকে স্থির চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, তোমার এ-আশঙ্কা বৃথা। আমি পাপ-পুণ্যের বাইরে। গুরুভার জিনিষকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু আমাকে এ-দু'টো বিন্দুমাত্রও টলাতে পারে না।

বলিয়া চুপ্ করিয়া থাকিয়া পুনশ্চ কহিতে লাগিলেন, তোমার পাপ-পুণ্য বিচার কর্‌বার ক্ষমতা আমার নেই, কল্পনা। তুমি হয়তো শুনে থাক্‌বে—আমার এই আশ্রমের কোনো রকম সঙ্কীর্ণতা নেই। ভারতবর্ষ যেমন সবাইকে দু'হাত বাড়িয়ে বুকে

স্থান দিয়েছে, হিংসা-দ্বেষ পোষণ করেনি, তেমনি আমার অমরাবতী-আশ্রম সব রকম লোককে আশ্রয় দিয়েছে। এবং যতোদিন আমি থাক্‌বো ততোদিন দেবে। তোমার জীবনের কাহিনী শোন্‌বার মতো সঙ্কীর্ণতা আমার নেই। আমার সে-উদ্দেশ্যও নয়। তুমি আশ্রয় চেয়েছো, আশ্রয় দিয়েছে তোমায় এই আশ্রম। যতোদিন এখানে থাক্‌বে, ততোদিন এর মর্য্যাদা, সম্মান মেনে চ'লো।

শুনিয়া কল্পনা, এই সাধু-ব্যক্তির মহানুভবতায় এবং সঙ্কীর্ণতা শূন্য মনের পরিচয়ে, নিজের অন্তর তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়া বসিল। যখন ব্যথা-বেদনা আসিয়া মন-প্রাণকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলে, যখন বুঝা যায়, যে-জীবন উপস্থিত চলিয়াছে, তাহার মধ্যে না আছে সুখের আলো, না আছে দুঃখের অন্ধকার—তখন, মানুষ চাহিয়া থাকে এমন একটা কিছু, যাহা এই আলো-আঁধারের বাহিরে।

কল্পনা কয়েক মুহূর্ত্ত পরে বলিল, আপনার আশ্রমকে আমি বড়ো ভাবিনে। বড়ো মনে করি আপনাকে, আপনার দেহটা বাদ্ দিয়ে অন্তরে যিনি আছেন তাঁকে।

—সে তো তোমারও আছে কল্পনা! আত্মা ছাড়া কি জীব সৃষ্ট হয়?

—তা' হয় না। এ আমি জানি। কিন্তু আমার আত্মা মরে গেছে। একে দিয়ে সাধু কাজ চলে না। একে বাঁচাতে চাই। তাই আপনার শরণাপন্ন হ'য়েছি।

কথাটা ইন্দ্রনাথের কানে তেমন সুস্পষ্ট অর্থ লইয়া বোধকরি

প্রবেশ করিল না। কহিলেন, আত্মা মরে গেছে, একি অদ্ভুত কথা ব'ল্‌ছো, কল্পনা? আত্মা যে অবিনশ্বর, এটা কি তোমার অজানা?

—আত্মা অবিনশ্বর, এ আমি জানি; যেমন আপনি জানেন। কিন্তু সে-জানার কোনো দাম নেই। কেননা, এর সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ কেউ দিতে পারেনি।

কথাটা ভাবিবার বটে। ইন্দ্রনাথ এই কয়েক মিনিট কল্পনার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছেন—সে সাধারণ স্ত্রীলোক নহে। তাহার কথা গুলি বাজে এবং অসঙ্গত বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। অথচ, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেও মন চাহে না।

ইন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিলেন, বিশ্বাস-ই হ'লো আসল জিনিষ, কল্পনা! এ-সব তত্ত্ব এতো সূক্ষ্ম যে, অবিশ্বাসের কণামাত্র মনে উদয় হ'লে বোঝানো যায় না। আত্মার অবিনশ্বরতা-সম্বন্ধে আমাদের ধর্ম্মপুস্তক যা' রেখে গেছে, তাকে সম্যক্‌ভাবে মেনে নিতে পারা যায়—যদি বিশ্বাস থাকে; নইলে এ-সন্দেহের মীমাংসা হয় না।

কল্পনা ইন্দ্রনাথের উক্তিতে মৌন হইয়া রহিল। বোধহয় সে মনে মনে ইহাকে মানিয়া লইয়া ছিল।

শিপ্রা ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার এক হাতে একখানা পাথরের থালায় নানা প্রকার ছাড়ানো ফল এবং গোটা কতোক মিষ্টান্ন। অপর হাতে একটা শ্বেতবর্ণের পাথর-বাটি। ইহাতে খাঁটি দুধ। কল্পনার হাতের কাছে সেগুলি নামাইয়া দিয়া বলিল, খেয়ে নাও কল্পনাদি'—রাত বড়ো কম হয় নি।

কল্পনা দুই মুহূর্ত্ত আহার্য্যের পানে চাহিয়া থাকিয়া শিপ্রার মুখে দৃষ্টি ফেলিল, কহিল, এতো, মানুষে খেতে পারে ?

শিপ্রা হাসিয়া কৌতুক করিয়া বলিল, মানুষে এতোটুকুই খায়। অ-মানুষে খায়, এর চেয়ে ঢের বেশী। তাদের খাওয়ায় পার নেই।

ইন্দ্রনাথ না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। কল্পনাকে কহিলেন, ও-বেটিকে পেরে ওঠা দায়। ওর বয়েসের তুলনায় বুদ্ধি আর জ্ঞান অনেক বেশী।

শিপ্রা কোপ্ প্রকাশ করিয়া বলিল, অতো প্রশংসা ক'রো না, বাবা। জানো তো আমিও মানুষ। প্রশংসায় আমার অহমিকা আস্‌তে পারে।

শুনিয়া ইন্দ্রনাথ হাসিয়াই কহিলেন, প্রশংসা শুন্‌লে যাদের অহমিকা আসে, তাদের দলের তুই ন'স্। তুই একেবারে আলাদা, মা! কল্পনার দিকে চোখ্ পড়িতেই বলিয়া উঠিলেন, হাত গুটিয়ে ব'সে রইলে যে, কল্পনা ? আহার্য্য তো সামান্যই। খেয়ে নাও, মা।

কল্পনা ইন্দ্রনাথের এই কথার ভিতরে আন্তরিকতার যথেষ্ট প্রমাণ পাইল। সে আর দ্বিরুক্তি না করিয়া পাথরের থালাটা কোলের দিকে টানিয়া লইল।

— তিন —

অবিবাহিত ইন্দ্রনাথের অমরাবতী-আশ্রমের একটা ইতিহাস আছে। বছর আঠারো পূর্ব্বে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আসেন। বড়ো লোকের ছেলে। কামনা এবং বাসনার অন্ত ছিল না। অকস্মাৎ যেমন আকাশের বুকে বিদ্যুৎ-রেখা দেখা যায়, তেমনি অকস্মাৎ ইন্দ্রনাথের মনে ভগবৎ-প্রেমের বিদ্যুৎ জাগিয়া উঠিয়া ছিল। এবং এই জাগরণের মধ্যে তাঁহার যতো কিছু ভোগ-বিলাস সমস্তই আগুনে পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া তাঁহাকে নূতন মানুষ করিয়া তুলিল। কয়েক বছর বিভিন্ন দেশে-দেশে পর্য্যটন করিয়া মহাপুরুষদের নিকট হইতে এই উপদেশ পাইয়া ছিলেন—একটা আশ্রম করিয়া সেখানে অনাথ ছেলে-মেয়েকে এবং সমাজের বাহিরের নারীদের সঠিক্‌রূপে মানুষ করিয়া তুলিতে। ইহাদের মূল-শিক্ষায় বিরাজ করিবে, ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করা; মানুষকে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ভালোবাসিবার শক্তি পোষণ করা।

ইন্দ্রনাথ মহাপুরুষদের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি নিজে পরম সাত্ত্বিক মানুষ। কিন্তু তাই বলিয়া লোককে জোর করিয়া তাহার অভিরুচির বিরুদ্ধে কিছু করাইতে সব সময়ে ইচ্ছুক নহেন। যে-সত্য নূতন রূপে দেখা দেয়, ইহাকে ঠিক্ মতো ধরিবার শক্তি আসে তখন-ই,

যখন মানুষ নিজেকে ভুলিয়া যায়—ভুলিয়া যায় যে, সে নিজে নিজেরই নয়, কোন্ এক অসীম, অনন্ত শক্তির সৃষ্ট সে।

শরদিন্দু ইন্দ্রনাথের প্রিয়-শিষ্য এবং দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ। এই ছেলেটির আকৃতি এতো সুন্দর যে, পুরুষেরও ভালো লাগে। দিন কতোকের জন্য সে আশ্রমের কাজে দেশান্তরে গিয়া ছিল। আজি প্রভাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে।

ইন্দ্রনাথ সবে পূজা-আহ্নিক সারিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, শরদিন্দু আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। গুরুর মুখ-প্রতি চাহিয়া কহিল, এ'কদিন আপনার কোনো কষ্ট হয়নি তো, গুরুদেব?

ইন্দ্রনাথ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন, কষ্ট হবার কি যো' আছে শরো! শিপ্রা আমার গায়ে মশা-মাছি পর্য্যন্ত ব'স্‌তে দেয়নি। এমনি-ই তার যত্ন।

শরদিন্দুর ভালো করিয়াই জানা আছে, শিপ্রা প্রকৃতই কতো স্নেহময়ী। এই আশ্রমের যতোকিছু দায়িত্ব সেই স্বেচ্ছায় নিজের উপর লইয়াছে।

ক্ষণকাল নিঃশব্দে ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া শরদিন্দু মাটির দিকে দৃষ্টি অবনত করিল, কহিল, আপনার চরণে আমার একটা মিনতি আছে, গুরুদেব।

ইন্দ্রনাথ শিষ্যের কাঁধের উপরে একখানা হাত রাখিয়া বলিলেন, এখন নয়। তোমার কথা শুন্‌বো পরে। এখন স্নান ক'রে পুজো-আহ্নিকে ব'স।

এই বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া উন্মুক্ত প্রান্তরে পড়িলেন।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া শরদিন্দু দেখিল, একপাল ছোটো ছোটো মেয়েকে চতুর্দ্দিকে রাখিয়া শিপ্রা মাঝখানে বসিয়া নিবিষ্টমনে তাহাদের পাঠাভ্যাস করাইতেছে। এমনি শিক্ষা দেওয়া তাহার নিত্যকর্ম্ম।

শরদিন্দু কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া শিপ্রার পড়ানো শুনিতে লাগিল। পূর্ব্বে সে বহুবার এমনি শুনিয়াছে। কিন্তু আজ তাহার মনে হইতে লাগিল—শিপ্রার কণ্ঠস্বর কী মধুর, কী লালিত্যপূর্ণ! শিপ্রার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহার মনে হইল, ইহাকে সহধর্ম্মিণীরূপে লাভ করিতে পারিলে, জীবন ধন্য হইবে। শিপ্রা হইবে তাহার সঙ্গিনী। সে হইবে তাহার সঙ্গী। এই দুইটি মধুর সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া তাহাদের উভয়ের মধ্যে গড়িয়া উঠিবে—সাম্যের অনন্ত সঙ্গীত। সেই সঙ্গীত-সুরে মুগ্ধ হইবে তাহারা—মুগ্ধ করিবে জগতের নর-নারীকে।

শিপ্রার পড়ানো প্রায় শেষ হইয়া আসিয়া ছিল। মুখ তুলিতেই চারি চক্ষে মিলন হইয়া গেল। শরদিন্দু হাসিল মাত্র। শিপ্রাও হাসিল, কহিল, এখুনি ফিরলেন বুঝি?

শরদিন্দু কথা না কহিয়া ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া শিপ্রা শরদিন্দুর নিকটে আসিল, বলিল, আমাদের আশ্রমে একটি নতুন লোক এসেছে। আসুন, তার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দি।

বলিয়াই সে নিঃসঙ্কোচে শরদিন্দুর একখানা হাত ধরিয়া লইয়া চলিল।

কল্পনা একাকী একটা ছোটো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং জগতের গত মহাপুরুষদের প্রতিকৃতি দ্বারা সুশোভিত কক্ষের মেঝেতে বসিয়া গুন্-গুন্ স্বরে কীর্ত্তন গাহিতে ছিল। শিপ্রার সহিত অপরিচিত সুশ্রী যুবকটিকে দেখিয়া সে সুর থামাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং ইহা দেখিয়া শিপ্রা মৃদু হাসিয়া কহিল, লজ্জা ক'রো না, কল্পনাদি'; অমরাবতী-আশ্রমের সভ্য হ'য়েছো, তখন অহেতুক-লজ্জাকে জয় ক'র্‌তে হবে যে!

বলিয়াই সে মুহূর্ত্তকাল পরে শরদিন্দুর যথাযথ পরিচয় দিয়া পুনশ্চ কহিল, তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রিয়ে দিতে এসেছি কল্পনাদি'। এমন মানুষ খুব কম-ই দেখা যায়। এঁর সঙ্গে কথা ক'য়ে শান্তি পাবে।

শুনিয়া কল্পনা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া বলিল, যে-কোনো মানুষের সঙ্গে কথা ব'লে সব সময়েই মনে শান্তি পাওয়া যায়, যদি মনের অবস্থা ভালো থাকে। নইলে, যতো ভালো লোকই হোক্ না কেন, শান্তি পাওয়া তো দূরের কথা, কথা কইতে পর্য্যন্ত ইচ্ছে হয় না।

কথাগুলি যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি সমর্থন করিবার বাহিরে। শিপ্রা মনে মনে যারপর নাই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল, কহিল, অর্থাৎ তোমার মন এখন ভালো নেই, কেমন? কিন্তু এ-ক্ষেত্রেও তো মানুষ, মানুষকে আরো বেশী ক'রে পেতে চায়। মানুষের সংসর্গটা তো তুচ্ছের এবং তাচ্ছিল্যের বস্তু নয়!

শিপ্রা আর সেখানে দাঁড়াইল না। শরদিন্দুকে লইয়া প্রস্থান করিল।

সে-দিন অপরাহ্ণ বেলায় ইন্দ্রনাথ আশ্রমের বাহিরে শ্যামল তৃণ-ভূমির একপার্শ্বে বসিয়া আকাশের পানে মুগ্ধ হইয়া কি দেখিতে ছিলেন। শিপ্রা নিঃশব্দে আসিয়া তাঁহার গা' ঘেঁষিয়া বসিতেই তিনি চক্ষু ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিলেন, দেখিলেন —শিপ্রার মুখাকৃতি অসম্ভব গাম্ভীর্য্যে ভরা। এতোখানি গাম্ভীর্য্য তিনি তাহার মুখে ইতিপূর্ব্বে দেখেন নাই। চিন্তিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, কি হ'য়েছে, মা? তোর মুখ অতো ভারী কেন?

শিপ্রা নীরব হইয়া রহিল।

ইন্দ্রনাথ তাহার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া নিরতিশয় মিষ্টস্বরে পুনর্ব্বার কহিলেন, রাগ ক'রেছিস্, শিপ্রা? ছিঃ! রাগ ক'র্‌তে নেই, মা! এতে মানুষের বড়ো ক্ষতি হয়।

শিপ্রা আরো কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকিয়া বলিল, কল্পনাদি'র ব্যবহার গুলো যেনো কেমন বিসদৃশ ঠেকে। ভদ্রতার লেশমাত্রও ওর মনে নেই—ওকে কোথা থেকে নিয়েলে, বাবা?

ইন্দ্রনাথ বুঝিলেন, কি একটা গুরুতর ঘটনার ফলে শিপ্রার মনেও বেদনার এবং অভিমানের রেখা অঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। কল্পনার কোনো পরিচয় তিনি জিজ্ঞাসা করেন নাই। জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন বলিয়াও তাঁহার মনে হয় নাই। পরিচয়টুকু নর-নারীর মর্য্যাদা যেমন বৃদ্ধি করে, তেমনি আবার হ্রাস করিয়া দেয়।

বলিলেন, যারা এখানে আসে শিপ্রা, তারা একটু ভিন্ন রকমের মন নিয়েই আসে। কিন্তু আমাদের তাতে দম্‌লে তো চ'ল্‌বে না, মা! আমাদের এই সব লোককে ভিন্ন দিকে নিয়ে যাবার যে চেষ্টা ক'র্‌তে হবে। এ-টুকু বিশ্বাস তাদের আছে, তাই তারা এখানে আসে। নইলে, পৃথিবীতে অন্য জায়গার অভাব হয় না।

শুনিয়া শিপ্রা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব হইয়া থাকিবার পর কহিল, সব চেয়ে বড়ো আশ্চর্য্যের কথা বাবা, যাকে তুমি দয়া ক'রে আশ্রয় দিয়েছো, সে আমাদের এই আশ্রমের বড়ো উদ্দেশ্যটাকে সব সময়ে একটা না-জানার অন্ধকারে ঢেকে রাখ্‌তে চায়। মানুষের এই কৃতঘ্নতাকে আমি অনুমোদন ক'র্‌তে পারিনে।

ইন্দ্রনাথ স্পষ্টই বুঝিলেন, শিপ্রার এই অভিযোগ কল্পনাকেই উদ্দেশ করিয়া। কহিলেন, সে যদি না-জানার অন্ধকারে আশ্রমের উদ্দেশ্যকে ঢেকে রাখ্‌তে চায়, তা' হ'লেও তাকে তো দোষ দিতে পারিনে, শিপ্রা! কিন্তু আমার মনে হয়, তুই ভুল বুঝেছিস্। সে তো তেমন মেয়ে নয়।

—তুমি জানো না, বাবা। ও ভালো ঘরের মেয়ে নয়। নিজের মুখে-ই আমাকে একদিন ব'লে ছিল—ওর ব্যবসাই ছিল, বড়ো লোকের ছেলেদের নানারূপে মন আকর্ষণ করা। বাজারের যে সব···

শিপ্রা কথাটা শেষ করিল না। ইহা দেখিয়া ইন্দ্রনাথ মনে মনে হাসিয়া কহিলেন, ও গণিকা; কেমন এই তো তুই ব'ল্‌তে চাস্?

এই বলিয়া তিনি শিপ্রার মুখের দিকে চোখ্ তুলিয়া চাহিলেন, দেখিলেন, সে নীরবে মুখ নীচু করিয়া বসিয়া আছে। ইন্দ্রনাথ মুহূর্ত্ত মাত্র মৌন থাকিয়া পুনরপি কহিতে লাগিলেন, কিন্তু হ'লেই বা! তাতে, তাকে ঘৃণা কর্‌বার আছে কি, শিপ্রা? সেও মানুষ, ভগবানের সৃষ্ট-জীব। হয় তো কোনো দুষ্ট লোকের প্রবঞ্চনায় বেরিয়ে এসে ছিল। তারপর যখন বুঝ্‌লে, তখন ফিরে যেতেও হয় তো চেয়ে ছিল তার বাড়ীতে। কিন্তু সমাজের যে-দ্বার একবার খুলে বেরিয়ে আসা যায়, সে-দ্বার ফিরে যাবার পথ দেয় না। তখনো ওর হয়তো কামনা-বাসনার শেষ হয় নি। কতোক্‌টা সমাজের 'পর অভিমানে এবং কতোক্‌টা নিজেকে শিথিল ক'রে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন ক'রে নিয়েছিল। কিন্তু মানুষের গত-চরিত্র নিয়ে বিচার ক'র্‌লে সব সময়ে ঠিক্ বিচার হয় না, মা! বর্ত্তমানটা তো উপেক্ষা কর্‌বার নয়!

কথায় কথায় দিনের অবশিষ্ট আলোটুকু অস্তমিত হইয়া ধরণীতে সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়া ছিল। শিপ্রা একবার চোখ্ তুলিয়া আকাশ-পানে চাহিয়া তখুনি দৃষ্টি নত করিয়া ইন্দ্রনাথের মুখ-প্রতি চাহিল, কিন্তু কোনো কথা বলিল না। একটু পরে সে আশ্রমের ভিতর চলিয়া গেল।

— চার —

একদার নিস্তব্ধ রাত্রি। শরদিন্দুর চক্ষুতে নিদ্রা নাই। তাহার মনে দৌর্ব্বল্য বাসা বাঁধিয়াছে বোধহয়। কল্পনার রূপই ইহার হেতু। এবং তাহারই দিকে মন ছুটিয়া চলিতে ছিল। এই ছুটিয়া চলার মধ্যে যে-ব্যাগ্রতা সন্নিহিত ছিল, তাহার মাপ-কাঠি আজ, এমনি সময়ে শরদিন্দু কোনো মতেই খুঁজিয়া পাইল না।

পাঁচ বছর পূর্ব্বে এমনি এক গভীর রজনীতে সে প্রথম অমরাবতী-আশ্রমে আসিয়া ছিল—দুর্ব্বল, ক্ষীণদেহ এবং ভগ্ন মন লইয়া। শিপ্রার একাগ্রতাপূর্ণ পরিচর্য্যায় শরদিন্দু তাহার সুস্থ দেহ এবং প্রফুল্লিত মন লাভ করিয়া ছিল।

শরদিন্দু উঠিয়া বসিল। কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া পূর্ণ এক গ্লাস জল এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া পার্শ্বে অবস্থিত ভাগ্‌বৎখানা টানিয়া লইয়া প্রদীপ জ্বালিল, জ্বালিয়া পুস্তকে মন দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু না; ভাগ্‌বৎ এখন তাহার ভালো লাগিতেছে না। ইহার সংস্কৃত শব্দগুলি শরদিন্দুর অন্তরে খোঁচা মারিয়া তাহাকে আরো বিমর্ষ করিয়া দিতে লাগিল।

বিরক্ত হইয়া শরদিন্দু বইখানা একপার্শ্বে তাচ্ছিল্যভরে রাখিয়া দিল। দিয়া ভাবিতে লাগিল—সহসা তাহার এই রূপজ মোহ আসিবার কারণ। আজ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সে

ইন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু সে-সব কল্পনার যৌবনে ও রূপশিখায় পুড়িয়া ভস্মীভূত হইল না-কি?

শরদিন্দু খুঁজিয়া একটা পিতলের বাঁশী বাহির করিল। আলোর সুমুখে ধরিয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল—ধূলা পড়িয়া ইহার আসল রূপটাই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বোধকরি—বহুদিন সে বাঁশীটা হাতে লয় নাই।

বাঁশী পরিষ্কার করিয়া শরদিন্দু সন্তর্পণে বাহির হইয়া আসিয়া শ্যামল তৃণের উপর বসিল, বসিয়া বাঁশীতে ফুঁদিল। এবং একটু পরেই কীর্ত্তনের করুণ-সুর বাজিয়া উঠিয়া, বাঁধন-হারা বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া দূরে, বহুদূরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

শরদিন্দু তন্ময় হইয়া বাঁশী বাজাইতেছে। মাথার উপর অসীমাকাশের বুকে শুভ্রচন্দ্র অপরূপ শোভা ধারণ করিয়া যেনো তাহারই দিকে তন্ময় ভাবে চাহিয়া আছে। কী মধুর বাঁশী বাজাইতে-ই না পারে সে!

এমনি অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। এক সময়ে শরদিন্দু ওষ্ঠ হইতে বাঁশীটা নামাইতেই সেই নির্ম্মল স্বাভাবিক আলোতে দেখিতে পাইল—একটি নারীকে। তাহার চক্ষুকে বিশ্বাস হইতে ছিল না। প্রশ্ন করিল, কে, কে ব'সে ওখানে?

—আমি, কল্পনা। কিন্তু আপনি কি ভয় পেয়েছেন?

—ভয়? ভয় আমি কারুকে ক'রিনে।

কল্পনা হাসিল। সে-হাসি দেখিলে বিগত-যৌবন পুরুষেরও প্রাণে যৌবনের মাদকতার স্পর্শ জাগিয়া উঠে। বলিল, কাউকেও ভয় করেন না? ভগবানকে?

—না, ভগবানকে ভয় ক'রিনে, বিশ্বাস ক'রি।

অনেকক্ষণ কেহ কোনো কথা কহিল না। কিন্তু এক সময়ে কল্পনা সেই নীরবতা দূর করিল। শরদিন্দুর মুখপানে চাহিয়া কহিল, আপনি কী চমৎকার বাঁশী বাজাতে পারেন! আমার কীর্ত্তনের সুর শুন্‌তে ভারী ভালো লাগে। বাজান্ না?

শরদিন্দু মাথা নাড়িয়া বলিল, না। সুর বাধা পেলে সেটা প্রাণহীন হ'য়ে পড়ে। এটা ভগবানের আশীর্ব্বাদ। ইচ্ছা হ'লেই সঙ্গীতকে কেউ নিজের হাতের মধ্যে পেতে পারে না।

কল্পনা প্রতিবাদ করিয়া কহিল, যে-জিনিষটা মানুষের নাগালের বাইরে চ'লে যায়, সে-টাকে সে ভগবানের আশীর্ব্বাদ এবং সাধনার বস্তু ব'লে ক্ষেপে ওঠে। কিন্তু যা' আয়ত্তের মধ্যে, তাকে সে নিজের ব'লে মেনে নেয়। এই দেখুন্ না; আমি সঙ্গীতকে কোনো দিন-ই ভয় ক'রিনে। যখন নানা রকম লোকের মন রাখ্‌বার ব্যবসা ক'র্‌তুম, তখন যে-কোনো সময়েই গানের সুর কণ্ঠে আন্‌তে হ'তো। কৈ, একদিনের জন্যেও তো নিজেকে শূন্য মনে ক'রিনি!

—আপনার কথা আলাদা।

—কেন আলাদা? আপনারা-ই তো বলেন—সব মানুষ ভগবানের সৃষ্ট। তবে একজন যে-কাজ পারে, অন্যে সে-কাজ পারেনা কেন?

শরদিন্দু এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। একটু পরে বলিল, আপনি যান এখান থেকে। এতো রাত্রে আপনাকে এখানে দেখ্‌লে, অনেকে অনেক কথা ভাব্‌বে।

—কি ভাব্‌বে লোকে ?

—সে অনেক কথা। সব কথা মেয়েদের খুলে বলা যায় না।

—কিন্তু শুনেছি—যাঁরা সাধুপুরুষ, তাঁরা কোনো কথা কারুর কাছে গোপন করেন না। তাঁদের ভেতর-বাইরে সমান।

কল্পনার এই মন্তব্যে শরদিন্দুর ভ্রূ-ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কল্পনার দৃষ্টিতে সেটুকু ধরা পড়িল, বলিল, রাগ ক'র্‌লেন ? কিন্তু জানেন্ তো আমার ব্যবসাই ছিল, কথা বেচে লোকের মন আকর্ষণ করা !

—না, রাগ আমরা ক'রি নে। নির্ব্বোধ মানুষের জন্যে দয়া হয় মাত্র।

বলিতে বলিতে শরদিন্দু উঠিয়া দাঁড়াইল।

কল্পনাও বসিয়া রহিল না। উঠিয়া কহিল, নির্ব্বোধ শুধু আমি নই, আপনিও। ওপরে সুনির্ম্মল আকাশ, নীচে চাঁদের সুবিমল জ্যোৎস্নাধারা, ততোধিক সুন্দর আপনি। নিজের রূপের এবং যৌবনের অপমান করেন যিনি এমনি অনুপম রাত্রে, তিনি নির্ব্বোধ ছাড়া আর কি ?

বলিয়া সে শরদিন্দুকে উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়া দ্রুত সে-স্থান ত্যাগ করিল।

শরদিন্দু বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। আজ তাহার মনে হইল, কল্পনা শুধু নারী নহে,—নারীর কামনা-বাসনা তাহার শিরা-উপশিরায় বহিয়া চলিয়াছে।

—পাঁচ—

অমরাবতী-আশ্রমটিতে দুইটি নারী একটি পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া পরস্পরের মধ্যে যে-আবহাওয়ার সৃষ্টি করিল, তাহাতে ইন্দ্রনাথ সত্য-সত্যই নিরতিশয় বিচলিত এবং ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিলেন। শরদিন্দুর দিক দিয়াও দেখিলেন, সে দিন কতোক ধরিয়া কেমন সকল বিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রনাথের সহিত বহুক্ষণ-ব্যাপি একাগ্রতা-সহকারে ধর্ম্মপুস্তক লইয়া আলোচনা করিত, এখন তিনি যাচিয়া আলোচনা করিতে গেলেও, শরদিন্দু দুই দণ্ড বসিয়া শুনিতে চাহে না। পূজা-আহ্নিক না করিলেই নয়, এমনি মন লইয়া সে কোনো প্রকারে সারিয়া লয়। ইহার মধ্যে এখন সে পূর্ব্বের মতো নিজেকে নিবিষ্ট করিতে পারে না। হয়তো পূজা-কালীন কল্পনার মূর্ত্তি তাহার দুই চক্ষুর উপর ভাসিয়া উঠে।

শিপ্রা পূর্ব্বে যে-রূপ নিজেকে সকল কাজের মধ্যে নিযুক্ত রাখিত, এখনো সেইরূপ রাখে। কিন্তু দেখিয়া মনে হয়—তাহার এই নিযুক্ত থাকার ভিতরে এখন নাই প্রাণ, নাই প্রেরণা। অন্তরের গভীরতম স্থান হইতে বেদনার যে-বিপুল উচ্ছ্বাস বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িতে চাহে, তাহা প্রাণপণে দমন করিয়া কাজে লিপ্ত থাকিলে যেমন দেখায়, ইহাও ঠিক্ তেমনি।

কল্পনার সাধিয়া শরদিন্দুর সহিত আলাপ করা, হাসা, এগুলি শিপ্রার দুই চক্ষুকে অত্যন্ত পীড়া দেয়। সময় সময় তাহার মনে হয়, দুই চক্ষুকে উত্তপ্ত লৌহের সাহায্যে চিরদিনের মতো অন্ধ করিয়া ফেলে। দৃষ্টিই যে মানুষের সকল অনিষ্টের কারণ।

অথচ শিপ্রা একদা কল্পনার সহিত শরদিন্দুর পরিচয় করিয়া দিয়া ছিল। এবং সেইদিন কল্পনা শরদিন্দুর উপর যে ঔদাসীন্য দেখাইয়া ছিল, তাহাতে শিপ্রার ক্রোধের সীমা ছিল না। এখন শরদিন্দুর উপর তাহার অনুরাগ দেখিয়া শিপ্রা পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রুদ্ধ এবং ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। মানুষ কতো ভুল-ই না করিয়া থাকে!

যখন এইভাবে দিন অতিবাহিত হইতে ছিল, তখন একদিন ইন্দ্রনাথ শরদিন্দুকে ডাকিয়া কহিলেন, তোমাদের দু'জনের মধ্যে কিসের একটা ঝড় ব'হে চ'লেছে। কিন্তু এটা তো ভালো নয়, শরো! মানুষের মন নিয়ে রেশারেশি আমি পছন্দ ক'রিনে। আমরা আশ্রমবাসী, গৃহত্যাগী; আমাদের যে এ-জিনিষটাকে ত্যাগ ক'র্‌তেই হবে!

শুনিয়া শরদিন্দু দুই, তিন মিনিট্ অধোমুখে মৌন হইয়া রহিল। তাহার পর এক সময়ে মুখ তুলিয়া ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া বলিল, আমাকে যাবার অনুমতি দিন্। এখানে আমার...

কথাটা শত চেষ্টায়ও সে পূর্ণ করিতে পারিল না। নত মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ইন্দ্রনাথ মনে মনে নিতান্তই নিরুৎসাহ হইলেন, বলিলেন, কেন? এই তো সে-দিন বাইরে থেকে এলে! আবার কেন?

—আমার এখানে আর ভালো লাগ্‌ছে না।

এই কথায় ইন্দ্রনাথ এতো অধিক বিস্মিত হইলেন যে, ক্ষণকাল কোনো বাক্যই তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল না। শরদিন্দুর নিকট হইতে তিনি এবম্বিধ উত্তরের তিলমাত্রও প্রত্যাশা করেন নাই।

ইন্দ্রনাথ সেই বিস্মিতভাব কাটাইয়া কি বলিবার উপক্রম করিতেই শরদিন্দু অকস্মাৎ তাঁহার পদদ্বয় চাপিয়া ধরিয়া, কাঁদিয়া ফেলিল এবং বাষ্পরুদ্ধস্বরে কহিতে লাগিল, আমি অবিশ্বাসী। আমায় ছেড়ে দিন্। আমি আর আপনাকে প্রতারিত ক'র্‌বো না। আমায় ক্ষমা করুন, গুরুদেব।

ইন্দ্রনাথ নীচু হইয়া তাহার হাত ধরিলেন, তাহাকে সোজা করিয়া দাঁড় করাইয়া দেখিলেন—তখনো তাহার দুই চোখের কোণ বাহিয়া অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে। হাত দিয়া শিষ্যের চক্ষু পরম স্নেহে মুছাইয়া দিলেন, দিয়া কোমল স্বরে বলিলেন, কাঁদিস্‌নে, শরো। তোদের চোখের জলে আমার এই শূন্য বুকটাও কেঁপে ওঠে, বাবা!

বলিতে বলিতেই তাঁহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া উঠিল। ইহা তাঁহার নিজের কানে ধরা পড়িতেই মুহূর্ত্তের দৌর্ব্বল্যকে জোর করিয়া দূর করিলেন, কহিলেন, আচ্ছা, যা' তুই। যেখানে তোর প্রাণ চায়। তুই যা'—তোকে আমি জোর ক'রে এখানে রাখ্‌তে চাইনে।

এই বলিয়া ইন্দ্রনাথ বোধকরি দুর্ব্বলতাকে দূর করিবার অভিপ্রায়ে দ্রুত সে-স্থান ত্যাগ করিলেন।

রাত্রে শিপ্রা শরদিন্দুর শয়ন-কক্ষের দ্বারে নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে আসিয়া দাঁড়াইল। কক্ষের দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ ছিল

না। সে হাত দিয়া সম্মুখ দিকে ঠেলিতে দ্বার উন্মুক্ত হইল।

একটা উন্মুক্ত জানালার মধ্য দিয়া চাঁদের স্নিগ্ধ-কিরণ আসিয়া পড়িয়া ছিল—নিদ্রিত শরদিন্দুর মুখের উপর। শিপ্রা অপলক-নেত্রে সেদিকে চাহিয়া রহিল। আজ তাহার অনেক কথাই মনে পড়িল। পাঁচ বছর পূর্ব্বে, শরদিন্দুকে সে-ই আপন হস্তে সেবা-শুশ্রূষা করিয়া মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া ছিল। পূর্ব্বের সেই দিনগুলি বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইতে ছিল। কিন্তু কোথায় হইতে কল্পনা আসিয়া তাহার জীবনের সমস্ত আশা, উদ্যম, প্রেরণা কোন্ এক যাদুকরের যাদু-মন্ত্রের মতো ফুৎকারে বাতাসের সহিত মিশাইয়া দিয়া গেল।

শিপ্রার চোখ্ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। শরদিন্দুর শিয়রে বসিয়া পড়িয়া তাহার কুঞ্চিত কেশপাশে নিজের অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিল, শরোদা'!

শরদিন্দু জাগিয়া, নিদ্রা যায় নাই। তাই এক ডাকে সাড়া দিয়া চক্ষু মেলিয়া চাহিল, দেখিল—জ্যোৎস্নার সহিত মিশ্রিত একটী জীবের ছায়াকে। এ-ছায়া তাহার অপরিচিত নহে।

শরদিন্দু উঠিয়া বসিল, কহিল, কে—শিপ্রা?

শিপ্রা নীরব হইয়া রহিল।

কিন্তু শরদিন্দু উদ্বিগ্নে সরিয়া আসিয়া প্রদীপ জ্বালিল। জ্বালিয়া প্রদীপ হাতে লইয়া শিপ্রার মুখের সন্নিকটে গেল। ভালো করিয়া দেখিল—তাহার হরিণীর ন্যায় দুইটি আয়ত নেত্রের তারা অশ্রুতে সিক্ত হইয়া উজ্জ্বলরূপ ধারণ করিয়াছে।

শরদিন্দু নিঃশব্দে ধীরে ধীরে প্রদীপটি যথাস্থানে রাখিয়া দিল, কহিল, এতো রাত্রে আমার ঘরে এসেছো কেন, শিপ্রা? তুমি আশ্রমের কোনো নিয়মই মান্‌লে না। গুরুদেব জান্‌তে পার্‌লে কি ভাব্‌বেন বল'তো? যাও শিপ্রা, তোমার নিজের ঘরে।

শিপ্রার কক্ষত্যাগ করিবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। সে গোপনে চক্ষু মুছিয়া মনের আবেগে বলিতে লাগিল, ভাবুন্ তিনি। তিনি এটুকু বোঝেন না, যে, মানুষে কতো বড়ো বেদনায় মানুষকে আশ্রয় ক'র্‌তে চায়! আশ্রমে প্রতিপালিত হ'য়েছি ব'লেই কি নিজের মনের উদ্বেগ এবং আকাঙ্ক্ষাকে জয় ক'র্‌তে পেরেছি? আমার মনের আকাঙ্ক্ষা এবং বাসনাকে আমি জোর ক'রে চেপে রেখে বাইরে সাধু ব'লে পরিচয় দিতে চাইনে। এতে নিজেকে তো প্রতারিত করা হয়, এমন কি অনেককেও প্রতারিত করা হয়। শরোদা', আমি এখানে আর থাক্‌তে চাইনে। যেখানে আপনি যাবেন, সেইখানেই আমাকে নিয়ে চ'লুন। নারীর প্রাণের কামনা, শুধু মনকে ফাঁকি দেওয়া নয়।

শরদিন্দু সাধারণ রক্তমাংসের মানুষ। আজ পাঁচ বছর যাবৎ যে-নারীর সংসর্গ সে লাভ করিয়া আসিতেছে, তাহাকে সে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। শিপ্রার মুখখানি নিজের দুই হাতের মধ্যে চাপিয়া দৃষ্টির উপর তুলিয়া ধরিল, আর্দ্র স্বরে চুপি চুপি কহিল, পার্‌বে, পার্‌বে শিপ্রা, আমার সঙ্গে এই রাত্রে পালিয়ে যেতে?

শিপ্রা অস্ফুট-স্বরে উত্তর দিল, পারবো।

—তবে এসো। খুব সাবধান্।

এই বলিয়া শরদিন্দু শিপ্রার একখানা হাত ধরিয়া কক্ষের বাহিরে আসিল। কেহ কোথায়ও নাই। গভীর রাত্রি গাঢ় নিস্তব্ধতার মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

— ছয় —

পরদিন প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া ইন্দ্রনাথ নিজের শয়ন-কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, আশ্রমের যে-সকল স্থান শিপ্রা নিজ হস্তে পরিষ্কার করিয়া রাখিত তাঁহার উঠিবার পূর্ব্বেই, সেই সকল স্থান অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকিয়া যেনো তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেছে।

ইন্দ্রনাথ ভাবিলেন, হয়তো আজ শয্যা ত্যাগ করিতে শিপ্রার বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। তাহার শয়ন-কক্ষের দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন, দ্বার উন্মুক্ত। শয্যার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, গত রাত্রে ইহার উপর কেহই নিদ্রা যায় নাই।

ইন্দ্রনাথের মন দুশ্চিন্তায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যে-পথ দিয়া আসিয়া ছিলেন, সেই পথ দিয়া ফিরিয়া গিয়া শরদিন্দুর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই স্থানে কাহাকেও দেখিলেন না। মাটিতে বিছানো শয্যার উপর দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিলেন, ইহার উপর গতরাত্রে শরদিন্দু শয়ন করিয়া ছিল। মাথার বালিশটা বিছানার বাহিরে গিয়া পড়িয়া ছিল, ইন্দ্রনাথ নত হইয়া সেটাকে বিছানার উপর নিঃশব্দে রাখিলেন। কক্ষের একদিকে পিল্‌সুজের উপর প্রদীপটা বসানো ছিল—ইন্দ্রনাথ প্রদীপসহ পিল্‌সুজটা সরাইয়া অন্য স্থানে রাখিলেন। কক্ষের যাবতীয় জিনিষ, এমন

কি, শরদিন্দুর কাপড়-চাদর পর্য্যন্ত যথাস্থানে বিরাজ করিতেছে। একটিও স্থানচ্যুত হয় নাই।

ইন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট রূপেই বোধগম্য হইল—শরদিন্দুর সহিত শিপ্রা তাঁহার অগোচরে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এমনি সংগোপনে চলিয়া যাইবার সঠিক্ কারণ ইন্দ্রনাথের অবধারিত হইল না। আজি প্রভাতে শরদিন্দুর যাইবার কথা ছিল। কোথায় যাইবে, তাহা ইন্দ্রনাথ পূর্ব্বদিন জিজ্ঞাসা করেন নাই। মনে করিয়াছিলেন—আজ প্রভাতেই জানিয়া লইবেন।

ইন্দ্রনাথ বাহিরে আসিয়া উন্মুক্ত আকাশ-তলের পথে কয়েক পদ হাঁটিয়া এ-দিক্, ও-দিক্ দৃষ্টি তুলিয়া চাহিলেন। তাহার পর সজলচক্ষে আস্তে আস্তে ফিরিয়া আসিলেন।

কল্পনা বাহিরে আসিতেই দেখিল, ইন্দ্রনাথ মাথায় হাত দিয়া সুমুখের চাতালটার উপর উবু হইয়া বসিয়া আছেন। নিকটে আসিয়া কহিল, কি হ'লো?

ইন্দ্রনাথ একবার চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন মাত্র। পরক্ষণেই সেইভাবে থাকিয়া বলিলেন, শরো আর শিপ্রা চ'লে গেছে।

—সে কি? কখন্ গেলো?

—কাল রাত্রে!

শুনিয়া কল্পনা কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে নত হইয়া ইন্দ্রনাথের একখানা হাত ধরিল, কহিল, ঘরে আসুন্!

ইন্দ্রনাথ আপত্তি করিলেন না। বাধাও দিলেন না। কল্পনার হাতের উপর ভর দিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

পূর্ব্বদিন মতো ইন্দ্রনাথ আজো পূজার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল

লইয়া উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু আজ শিপ্রা নাই, শরদিন্দু নাই। চক্ষু বুঝিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে গিয়া কেবল-ই তাহার কমনীয় মুখখানি মনে পড়িতে লাগিল। শিপ্রার মুখের কথা গুলি পর্য্যন্ত আজ এমনি সময়ে ইন্দ্রনাথের স্মরণ হইতে লাগিল এমনি রূপে যে, তিনি বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। পূজাঅসমাপ্ত রাখিয়াই আসন ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যে আশ্রমের বাহিরে আসিয়া সোজা পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

আশ্রমে যখন ইন্দ্রনাথ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন দিনমণি আকাশের মধ্যস্থলে। কল্পনা পূর্ব্ব হইতে পা' ধুইবার জল এবং গামছা ঠিক্ করিয়া রাখিয়া ছিল। তিনি আসিতেই সে সযতনে তাঁহার পা' দুইটি ধুয়াইয়া গামছার সাহায্যে পরম যত্নে মুছাইয়া দিল। কহিল, খাবেন চ'লুন্, বাবা!

আজ সর্ব্বপ্রথম ইন্দ্রনাথকে কল্পনা এই সম্বোধন করিল।

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ইন্দ্রনাথ আহারে বসিয়াছেন। কল্পনা কক্ষের বাহিরে বসিয়া তত্ত্বাবধান করিতে ছিল। ইন্দ্রনাথ ইহা লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু মুখে কিছুই প্রকাশ করিলেন না।

সামান্য আহার করিয়া ইন্দ্রনাথ উঠিয়া পড়িতেই কল্পনা ব্যাগ্রতাসহকারে কহিয়া উঠিল, ওকি বাবা? কিছুই যে খেলেন না?

ইন্দ্রনাথ অশ্রুগোপন করিয়া হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, আমার খাওয়া এর আগে তুমি দেখোনি। আমি যা' খাই তাই খেয়েছি। অভ্যাসকে আমি উপেক্ষা ক'রিনে।

কল্পনা এ-কথার জবাব দিল না। তাহার মনে হইল— ইন্দ্রনাথের অন্তরে আজ ফাঁক্ এবং ফাঁকির অন্ত নাই।

— সাত —

সে বছর কতোক পূর্ব্বের কাহিনী। কল্পনা কলিকাতার কোনো একটা সম্ভ্রান্তশালী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহার মা' গত হন—শৈশবে। সুতরাং, মাতৃ-স্নেহ যে কি জিনিষ তাহা কল্পনার অজ্ঞাত ছিল। পিতা তাহার ব্যবসায়ী। দিবারাত্রি টাকাকড়ির ব্যাপার লইয়াই থাকিতেন। বাড়ীতে চাকর, দাসী প্রভৃতি মাহিনা করা লোক অন্দর মহলে রাজত্ব করিত। সেখানে কল্পনার স্থান যেখানেই থাকুক্ না কেন, মনে ছিল না একতিল শান্তি।

কলেজে পড়া মেয়ে সে। একে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা। তাহার উপর বাড়ীতে সে থাকিত, অনাদৃতা, উপেক্ষিতার মতো। পিতা প্রয়োজন না হইলে কথা কহিতেন না, বলিবার সময়ও বোধকরি থাকিত না। ব্যবসায় অর্থাগম হইতে ছিল, প্রচুর। এবং এই অর্থ-লোভ তাঁহাকে জগতের স্নেহ, মমতা এবং কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য হইতে দূরে, বহু দূরে টানিয়া লইয়া কঠোর ঔদাসীন্যের অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়া ছিল।

কল্পনার সর্ব্বাবয়ব বেষ্টন করিয়া তখন যৌবনের বান্ ডাকিয়া ছিল। এই সময়ে সে একদা যে-কাজ করিয়া বসিল উন্মাদনায়, তাহার পরিসমাপ্তি যে কোথায়, তাহা আজো বোধহয় সে নির্দ্ধারণ করিতে পারে নাই। এ-যেনো শৈল-শিখর হইতে

প্রবাহিতা স্রোতস্বিনী নদীর মতো। নীচের লোকে ঠিক্ করিতে পারে না—কোথায় ইহার উৎপত্তি আর যাইবেই বা কতোদূর!

কলেজের 'কো-এডুকেশ্যন্' বাংলা দেশের ভালো করে, কি মন্দপথে নর-নারীকে জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে টানিয়া লইয়া যায়, সে-মীমাংসা করা উদ্দেশ্য নয়। তবে ইহার সহিত কল্পনার জীবনের যে-ধারা মিশ্রিত হইয়া আছে, তাহাকে লইয়া আলোচনা করা একটা আবশ্যকীয় ব্যাপার বটে!

ছেলেটির নাম, সুকোমল। কল্পনার সহিত একক্লাশেই পড়িত। দুই জনের মধ্যে আলাপ হয়—কলেজের একটা বাংলা প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতাকে সূত্র করিয়া। ছেলেটির মেধা—অনন্য-সাধারণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের গত পরীক্ষায় প্রথম অথবা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার দিকে তাহার তেমন লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু পাণ্ডিত্যের দিক দিয়া ধরিতে গেলে, অধ্যাপকগণও সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিতেন—লেখাপড়ার সম্বন্ধে অনেক কিছুই এই ছাত্রটির কাছে শিখিবার মতো জিনিষ আছে।

কল্পনারও অজানা ছিল না, ছেলেটির প্রতিভা। তাহার বাংলা এবং ইংরাজি ভাষার পরিপুষ্ট জ্ঞানের পরিচয় সে পাইয়া ছিল—বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় ছেলেটির প্রবন্ধ পড়িয়া। প্রবন্ধ রচনায় ছেলেটির বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় শুধু কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং অধ্যাপক মহলের জানার সীমানায় আবদ্ধ হইয়া পড়ে নাই। বাহিরের লোকেও তাহাকে চিনিয়া ছিল।

তাই একদিন কল্পনা কলেজের ছুটির পর পথেব উপরে ছেলেটিকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া ছিল, একটু দাঁড়াবেন ?

ছেলেটি দাঁড়াইয়া ছিল। ঘাড় ফিরাইতেই চোখে পড়িয়া ছিল—কল্পনাকে। একটু ইতস্ততঃ করিবার পর সে প্রশ্ন করিয়া ছিল, আমাকে কিছু ব'ল্‌বেন ?

কল্পনা মুখ নীচু করিয়া একখানা বাঁধানো অতি চমৎকার খাতা ছেলেটির হাত লক্ষ্য করিয়া বাড়াইয়া দিয়া নিরতিশয় শান্তস্বরে বলিয়া ছিল, আমার এই প্রবন্ধটা যদি একটু দয়া ক'রে দেখে দেন্ !

—প্রবন্ধ—কিসের প্রবন্ধ ?

তাহার পর কলেজের আসন্ন প্রতিযোগিতার কথা মনে পড়িয়া যাওয়াতে পুনশ্চ বলিয়া ছিল, কম্‌পিটিশ্যনের জন্যে বুঝি আপনি তৈরী হ'চ্ছেন্ ? আচ্ছা দিন্—দেখে দোবো।

এই বলিয়া সুকোমল কল্পনার হাত হইতে খাতাখানা নিজের হাতে লইয়া ছিল।

ইহাই তাহাদের প্রথম আলাপ-পরিচয়ের সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

কিন্তু সমুদ্রের বিশালতা জল-কণার একত্র সমষ্টি। এই দুইটী অবিবাহিত তরুণ-তরুণীর এই প্রথম লজ্জার মধ্য দিয়া আলাপ-পরিচয়টুকু সময়ের বৈগুণ্যে প্রেমের ধারায় গভীর হইয়া উঠিয়া ছিল।

আলাপের প্রথম পর্য্যায় যেটুকু সলজ্জভাব তরুণ নর নারীর মনের ভিতর থাকে, পরে মেলা-মেশার প্রভাবে সেটুকু কালো মেঘের মতো ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া যায়। আর সেই

অপসরণের মধ্যে যে-রূপ এবং আলো তাহারা দেখিতে পায়, তাহাতে নিজেরা তো এক সময়ে বিস্মিত হয়-ই, এমন কি বিশ্বের আরো দশ জনকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া তুলে।

এমনি বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটিয়া ছিল—কল্পনার পূর্ব্ব-জীবনে। ইহার জন্য আজো পর্য্যন্ত সে প্রাণে অনাবিল শান্তি খুঁজিয়া পায়না।

আর সেই ছেলেটি? তাহাকে দোষ দেওয়া যায় কি? যে-মহীরুহ গৃহের দক্ষিণভাগে মাথা উঁচু করিয়া গৃহস্থের আলো অবরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার বীজ যাহাতে মাটিতে উপ্ত হইতে না পারিত, সে-দিকে তো গৃহস্বামীর লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল? কল্পনাদের বাড়ীতে প্রত্যহ চায়ের নিমন্ত্রণ, এবং চা'-পান ইত্যাদি সমাপনে ইডেন্ গার্ডেন্ ভ্রমণে দুই জনে বাহির হইয়া, অধিক রাত্রে মোটরে করিয়া কল্পনাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া যাওয়া, কল্পনার ব্যবসায়ী-পিতার দৃষ্টি এড়ায় নাই। কিন্তু, ইহার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার প্রতিষেধক সাব্যস্ত না করিয়া পূর্ব্বের ন্যায়-ই উদাসীন রহিলেন। ইহাতে এই ফল হইল যে, একদা কল্পনাকে লইয়া ছেলেটি গা' ঢাকা দিল।

হিন্দু-বাঙালীর সংসারে পূর্ব্বরাগ নাকি এই জন্যই ভয়াবহ। একটি ছেলে, একটি মেয়ের ভালোবাসায় পড়িয়া উন্মত্ত হইয়া উঠে! যদি একজাতির মধ্যে ভাগ্যক্রমে পূর্ব্বরাগ জমিয়া উঠে, তবে বিবাহের এবং সমাজের দিক দিয়া উভয়ের পক্ষেই শান্তিপ্রদ। কিন্তু উভয়ে ভিন্নজাতির হইলে, অনেক স্থলে ইহার পরিণাম বড়োই শোচনীয় হইয়া দেখা দেয়।

নারী কুসুমের মতো। শুধু মৌমাছির ন্যায় মধু চয়ন করিবার লোভে কুসুমে মুখ দিলে চলিবে কেন? নারী স্বাধীন নয়। পুরুষের উপর নিজেকে বিলাইয়া দিয়া ভবিষ্যৎ উহারই হস্তে ন্যস্ত করে। কিন্তু পুরুষ সে-বিশ্বাসের, সে-একান্ত নির্ভরতার মূল্য বুঝে কৈ? আপনার ষোলো আনা দাবী পূরণ করিয়া নারীকে ছাড়িয়া দিয়া ভাবে—আপদ্ গেল।

কিন্তু নারী? যাহাকে সে একবার আত্মসমর্পণ করিয়াছে—ভুলেই হৌক আর স্বেচ্ছায়-ই হৌক—আজীবন হয়তো তাহাকেই স্মরণ-মন্দিরে দেবতা করিয়াই রাখিয়া দিবে! মাত্র অর্ঘ্যের প্রভেদ!

তাই, কল্পনাকে ছাড়িয়া দিয়া যখন ছেলেটি চলিয়া গেল, তখন কল্পনার না রহিল গৃহে ফিরিয়া যাইবার উপায়, না রহিল সমাজের দরজা উন্মুক্ত।

ভাদ্রের ভরা-নদীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়।
এই সৌন্দর্য্যের মাপ-কাঠি নারীর ভরা-যৌবনের সহিত সামঞ্জস্য রাখে। কল্পনার রূপ গণিকা সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারিল না। এবং একদিন যে-বাড়ীতে কল্পনা বাস করিতে ছিল, সেই বাড়ীর বিগত-যৌবনা একটি মহিলা কানে-কানে যে-প্রস্তাব করিল, তাহাতে কল্পনার সর্ব্বশরীর ঘৃণায় এবং কুণ্ঠায় শিহরিয়া উঠিয়া ছিল।

কিন্তু মানুষ—মানুষ-ই। সে দেবতা বা দেবী নহে। দূষিত আবেষ্টনের প্রভাব মানুষের উপর পড়া খুবই স্বাভাবিক। কল্পনা একদিন নিজের দুর্ব্বলতায় পা' পিছ্‌লাইয়া পড়িল।

কিন্তু বেশীদিন নহে। একদিন রাত্রে গোপনে সে পালাইয়া আসিল। শুনিয়া ছিল—অমরাবতী-আশ্রমের কথা। শুনিয়া ছিল সে—ইন্দ্রনাথের সাধুতার কাহিনী।

— আট —

মস্ত বড়ো বাড়ী। কলিকাতারও বুকের উপর এমনি ইমারৎ সচরাচর চোখে পড়েনা। বাড়ীর প্রকাণ্ড গেটের দুই ধারে দুইটি শিপাই—বন্দুকে সঙ্গীন লাগাইয়া কাঁধে বহিয়া, দাঁড়াইয়া থাকে। গেট্ পার হইলে—প্রাঙ্গণ। ইহারই মাঝামাঝি জায়গায় —ঝরণা।

প্রাঙ্গণ পার হইলেই পূজার দালান। পূর্ব্বে ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব হইত। এখন লোকের অভাবে বন্ধ হইয়া আছে!

শরদিন্দুর দাদা আর বৌদির একসাথে মৃত্যু বড়োই মর্ম্মন্তুদ্ কাহিনী। কি একটা হিন্দুর মহাপর্ব্বোপলক্ষে তাঁহারা স্বামী-স্ত্রীতে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া ছিলেন। হঠাৎ জোয়ারের মুখে পড়িয়া যাওয়ায় শরদিন্দুর বৌদি স্রোতের মধ্যে তলাইয়া গেলেন। দাদা সাঁতার জানিতেন না। কিন্তু জীবনের মায়া না করিয়া বৃথা স্ত্রীকে রক্ষা করিতে গিয়া, নিজের জীবনও গঙ্গা-বক্ষে বিসর্জ্জন দিলেন।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় শরদিন্দু অন্তরে-অন্তরে নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠিয়া ছিল। কী ভালোই না বাসিতেন তাহাকে দাদা, বৌদি। ইঁহাদের মৃত্যুতে সংসারের প্রতি শরদিন্দুর বীতশ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিয়া ছিল। তাই, একদা নিমাই সন্ন্যাসের ন্যায় মাতার অজ্ঞাতসারে গৃহ ত্যাগ করিয়া ছিল। মনে

করিয়া ছিল—যৌবনটাকে আশ্রম-কার্য্যে ব্রতী করিয়া অন্তরে শান্তি পাইবে।

কিন্তু কামনা যাহার শেষ হয় নাই, ত্যাগ তাহার পক্ষে সাজে না। শরদিন্দু শিপ্রাকে পাইয়া জীবনকে পুনর্ব্বার নূতন রূপে দেখিল। সংসারী মানুষের মতো তাহার মনোবৃত্তি। ইহাকে সে কোনো মতেই দূর করিতে পারে নাই।

শিপ্রার সহিত বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার দিন দুই পরে শরদিন্দুর বৃদ্ধা মাতার মৃত্যু হইয়াছে। মার শ্রাদ্ধ-শান্তি যথা সময়েই খুব আড়ম্বরের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গেল। প্রত্যেকেই পেট ভরিয়া আহার করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে বলাবলি করিতে লাগিল—এমন খাওয়া তাহারা বহুদিন খায় নাই। ভগবান শরদিন্দুকে দীর্ঘায়ু এবং অরো অর্থশালী করুন!

* * * * *

শরদিন্দুর বাড়ীর পুরোহিত শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্যের বয়স প্রৌঢ়ত্বের সীমার বাহিরে আসি-আসি করিতে ছিল। প্রাত্যহিক গঙ্গাস্নান করা অভ্যাস আছে বটে, কিন্তু কপালে তিলক্ কাটিবার সাধ নাই। মাথার উপরে শিখা আছে, তবে দৈর্ঘ্যে অল্প। কখনো সাদা থান পরিয়া, গায়ে চাদর জড়াইয়া পথে বাহির হন, আবার অফিসে যাইবার সময় কালা-পেড়ে মিলের পাৎলা ধুতি এবং আদ্ধির পাঞ্জাবী অঙ্গে ধারণ করেন। মোট-কথা ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্থলে হস্তপদ সঞ্চালন করেন, এবং সময়োপযোগী গভীর

জলেও সন্তরণ করেন। এ যেনো কতোকটা নিজেকে বাঁচাইয়া স্বার্থের প্রতি ছুটিয়া চলার মতো।

একদিন অপরাহ্ন বেলায় শরদিন্দু শিপ্রাকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতে ছিল। নীচে শম্ভুনাথের গলার আওয়াজ পাইয়া শিপ্রাকে কহিল, ঠাকুরমশাই এসেছেন শিপ্রা, তুমি নীচে গিয়ে ওঁকে আসন পেতে ব'স্‌তে দাও। আমি এখুনি যাচ্ছি।

শুনিয়া শিপ্রা মুহূর্ত্তের মধ্যে গম্ভীর হইয়া উঠিল, কহিল, কিন্তু আমার ওঁকে বড়ো ভয় করে। তুমি তো জানো, আমাকে এখানে আনা অবধি ওঁর অস্বস্তির আর চিন্তার যেনো শেষ নেই। তোমায় আমায় যা'তে ছাড়াছাড়ি হয়, তারই পরামর্শ দিতে উনি আজো এখানে এসেছেন।

শরদিন্দু কাঁধের উপর সিল্কের চাদরখানা তুলিয়া লইয়া আশ্বাস দিয়া বলিল, ভয় কি, শিপ্রা? তোমাকে এখানে আনায় যদি ঠাকুরমশাইয়ের দুশ্চিন্তার অন্ত না থাকে, তবে তা'তে আমাদের কোনো ক্ষতি হবার আশঙ্কা নেই। মা হঠাৎ মারা গেলেন, তাইতে তো' বিয়েটা স্থগিদ্ রইলো।

শিপ্রা এ-কথার প্রতিবাদ তুলিল না। সে শরদিন্দুকে জানে। লোকের কথায় নিজেকে হাল্কা করিবার মতো লোক সে নয়।

শিপ্রা নীচে নামিয়া আসিয়া শম্ভুনাথকে প্রণাম করিল। কিন্তু আশ্চর্য্য! তিনি ব্যস্ত হইয়া দুই পা' পিছন দিকে সরিয়া গেলেন। মুখে বলিলেন, থাক্—থাক্ আর পেন্নামে কাজ নেই!

তাহার পর আড়চোখে চাহিয়া গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া কহিলেন, শরো গেলো কোথায়? ওর সঙ্গে আমার একটু প্রয়োজন আছে।

শিপ্রা এ-কথার জবাব দিল না। একখানা বাঘছালের আসন, লাল-সিমেণ্ট-করা মেঝের উপর যত্নের সহিত পাতিয়া দিয়া বলিল, ব'সুন্।

শম্ভুনাথ দ্বিরুক্তি করিলেন না। আসনের একপার্শ্বে নূতন ম্যাড্রাসী স্লিপার জোড়া খুলিয়া রাখিয়া বসিয়া পড়িলেন। এবং একটু পরে ট্যাক্ হইতে নস্যর কৌটা বাহির করিয়া হাতে লইলেন।

অল্পক্ষণ পরে শরদিন্দু নীচে নামিয়া আসিয়া শম্ভুনাথকে প্রণাম করিল, কহিল, ভালো আছেন ঠাকুরমশাই?

ঠাকুরমহাশয় মুখ তুলিয়া শরদিন্দুর মুখ-পানে চাহিয়া বিস্ময়ে কিছুক্ষণের জন্য হতবাক্ হইয়া রহিলেন। সর্ব্বনাশ! শরদিন্দু হইয়াছে কি? এই অল্পকালের ব্যবধানে মানুষের এতো পরিবর্ত্তনও হইতে পারে? শরদিন্দুর চোখে রীম্‌লেশ সোণার চশমা, গায়ে সিল্কের ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবী, পরণে ফিন্‌ফিনে জরি-পাড় ধুতি, কাঁধে সিল্কের চাদর—সমস্তই ব্রাহ্মণের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিল।

শরদিন্দু হাসিয়া ফেলিল, বলিল, ওকি ঠাকুরমশাই? অবাক্ হ'য়ে আমার দিকে দেখ্‌ছেন কি?

শম্ভুনাথ দৃষ্টি নামাইয়া একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, বলিলেন, তোমাকে যে চেন্‌বার যো' নেই, শরো। তোমার এতো বাবুয়ানি আমার ভালো লাগে না।

শরদিন্দু রাগ করিল না। সহাস্যেই কহিল, কি আর ক'রি ব'লুন্ ঠাকুরমশাই? বাবার বিষয়টা তো ভোগ্ ক'র্তে হবে। নইলে, তাঁর সঞ্চিত-অর্থের যে অপমান করা হয়।

শম্ভুনাথ মুখে একটা ঘৃণাসূচক অব্যক্ত শব্দ করিয়া বলিলেন, তোমার বাবার সঞ্চিত-অর্থ দু'হাতে কাপ্তেনী ক'রে উড়িয়ে দিলেই বুঝি তাঁর আত্মার সংগতি হবে? ব'লি, তোমার ভাই-পোটার কথা একবার ভেবে দেখেছো কি? ওর বিষয়···

শরদিন্দু শম্ভুনাথের কথায় বাধা দিয়া গম্ভীরভাবে বলিয়া উঠিল, বাবার আত্মার সংগতি কিসে হবে, তা' আপনারা ব'ল্তে পারেন না, আমরাও পারিনে। কিন্তু তাঁর টাকার 'পর আপনার এই অহেতুক ব্যস্ততা যেমন আমাকে পীড়া দেয়, বাবার আত্মাকেও তেম্নি হয়তো কষ্ট দেয়। আমি পাঁচ-ছ' বছর বাড়ী ছাড়া হ'য়ে বৈরাগ্য নিতে গেছলুম। কিন্তু সে তো আমার জন্যে নয়। তাইতে তো আবার আমাকে ফিরে আস্তে হ'লো। আর আমার ভাইপোর কথা? সে তো আমারই আলোচ্যের বিষয়। আপনাদের এ-সব ব্যাপারে না আসাই বোধকরি বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

বলিয়া শরদিন্দু একবার শিপ্রার মুখ-প্রতি চাহিয়া শম্ভুনাথের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিল, আচ্ছা ঠাকুরমশাই, এখন আমরা একটু বেড়াতে বেরুবো। আপনি না হয়, বাইরের ঘরে গিয়ে ব'স্থন্। দ্বারবানকে ব'ল্ছি, ও আপনার যত্ন নেবে'খন্।

বলিয়াই সে দ্বারবানের নাম ধরিয়া ডাকিবার উপক্রম করিতেই শম্ভুনাথ অকস্মাৎ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, থাক্ বাবা, আমি-ই যাচ্ছি।

এই বলিয়া তিনি কটাক্ষে শিপ্রার দিকে চাহিয়া জুতা পরিয়া পা' বাড়াইলেন।

— নয় —

রাত্রি নয়টা হইবে। শরদিন্দুর হাতে ঘড়ি ছিল না। থাকিলে নিশ্চয় সে সময় দেখিয়া আরো খানিকক্ষণ মাঠে হাওয়া খাইত। তাহার প্রাণে এ'কয়দিনে যেনো নূতন করিয়া সাড়া লাগিয়াছে। আশ্রমের গণ্ডীর ভিতর যতো সৌন্দর্য্যই সন্নিবেশিত থাকুক্ না কেন, সে-সৌন্দর্য্যের মধ্যে এমনি অপূর্ব্ব মোহ সে বোধকরি দেখিতে পায় নাই। মানুষ এমনিই ভোগের পূজারী যে, জীবনকে একবার ভোগের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে, সহসা বাহির হইয়া আসিতে পারে না। এই জন্য হয়তো বৈরাগ্যের মূল্য এবং মর্য্যাদা এই সংসারের রাজকীয় সুখ-ঐশ্বর্য্যের সহিত পার্থক্য রাখিয়া চলে।

বাহিরে শরদিন্দুর মোটর অপেক্ষা করিতে ছিল। আজ সে ইচ্ছা করিয়াই সোফার্‌কে সঙ্গে আনে নাই। বহুদিন গাড়ী চালায় নাই বলিয়া আজ নিজের চালাইবার স্পৃহা জাগিয়া ছিল।

দুইজনে গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। শরদিন্দু সেল্‌ফ-ষ্টার্টার স্পর্শ করিতে গাড়ী চলিতে সুরু করিল।

কয়েক মিনিট্ কেহ কোনো কথা না বলিয়া নীরবেই বসিয়া রহিল। কিন্তু সেই নীরবতা দূর করিল শিপ্রা, কহিল, আচ্ছা, আমাদের এম্‌নি মেলামেশা লোক-চক্ষুতে খুব্ খারাপ, না?

শরদিন্দু ষ্টিয়ারিং ঈষৎ বামদিকে ঘুরাইয়া গাড়ীখানাকে ফুট্‌পাথের কিনারায় লাগাইয়া চালাইতে চালাইতে বলিল, খারাপ —খারাপ কেন?

শিপ্রা কপালের চুলগুলি হাত দিয়া সরাইতে সরাইতে কহিল, নয়তো কি? আমাদের এখনো বিয়ে হয় নি। অবিবাহিত অবস্থায় এক বাড়ীতে থাকা, একই গাড়ীতে দু'জনে পাশাপাশি ব'সে হাওয়া খেতে যাওয়া, এ-সব কি লোকের সহ্য সীমায় থাকবে?

শুনিয়া শরদিন্দু কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ্ করিয়া রহিল, বলিল, বাইরের লোকের মতামতে আমাদের কি যায় আসে, শিপ্রা? সমাজ আমি মানিনে। এটা মানুষের সুখ-শান্তিকে যূপকাষ্ঠে ফেলে বলি দেয়। লোকের কথায় কিম্বা কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে অনেকে, অনেকের বিরুদ্ধে ভিন্নমত পোষণ করে। সেই নিয়ে লোককে বিচার ক'রতে গেলে, বহুস্থলে নিজেকেই ঠকতে হয় বেশী। তখন মনে অশান্তির ও পরিতাপের অন্ত থাকে না।

—বাঁচ্তে হ'লে মানুষকে সমাজের সঙ্গে সন্ধি ক'রতে হবে। নইলে, শান্তি তো দূরের কথা, সুখও আসে না।

একটুখানি নীরব থাকিয়া, পুনশ্চ শিপ্রা কহিল, সামাজিকতা সৎলোকের জন্যে তো শুধু নয়। এ-যে মন্দ লোকের জন্যেও। যারা সমাজের গণ্ডীর বাইরে যেতে চায়, তাদের যাওয়ার মূলে বেশী ক'রে থাকে—স্বার্থপরতা।

শরদিন্দু জবাব দিল না। গাড়ীর বেগ বাড়াইয়া দিল। এবং ফাঁকা রাস্তার উপর দিয়া মোটর হাওয়ার মতো ছুটিয়া কিছু-কাল পরে বাড়ীর সুমুখে দাঁড়াইল।

পরদিন প্রাকালে শয্যা ত্যাগের পর নীচে নামিয়া আসিয়া শিপ্রা শরদিন্দুকে দেখিতে পাইল না। অন্যদিন সে পূর্ব্বেই বিছানা

হইতে উঠিয়া পড়ে। প্রাত্যহিক ব্যায়াম করা তাহার অভ্যাস। আশ্রমে থাকিয়া শারীরিক শ্রম করা তাহার অভ্যাস হইয়া ছিল। সেখানকার নিয়মিত আচার-পালন এখন সে একপ্রকার পরিহার করিয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু ব্যায়াম করা অভ্যাসটা সে ছাড়িতে পারে নাই।

শিপ্রা আজ শরদিন্দুকে ব্যায়াম করিবার স্থানে দেখিল না। তখনো চাকর, দ্বারবান কেহ উঠে নাই।

শিপ্রা উপরে উঠিয়া গেল।

শরদিন্দুর ঘরের দরজা অর্গলবদ্ধ ছিল না। কোনো দিনও থাকিত না। শুধু ভেজানো থাকিত।

শিপ্রা আস্তে আস্তে দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল।

শরদিন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া সে বুঝিল এখনো শরদিন্দু নিদ্রায় মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। অন্তরের এক কোণে তাহার লালসার দুর্ব্বলতা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে ছিল। শিপ্রা শরদিন্দুর মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়াও সঙ্কোচে ধীরে ধীরে সরিয়া আসিল—খোলা জানালাটার দিকে। জানালাটার দিকে মুখ করিয়া সে বাহিরের আকাশের পানে অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া রহিল। কিন্তু এক সময়ে শরদিন্দুর একখানা হাত তাহার কাঁধ স্পর্শ করিতেই সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখে চোখ্ পড়িতে সে চোখ্ নামাইয়া আনতমুখে শরদিন্দুর পায়ের দিকে চাহিয়া, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

গতরাত্রে শরদিন্দুর সুনিদ্রা হয় নাই। ঘরের দেওয়ালে বিলম্বিত ক্লকটা যখন রাত্রি দ্বিপ্রহরের বার্ত্তা সশব্দে জানাইয়া

দিয়া গেল, তখনো সে বিছানায় পড়িয়া এ-পাশ ও-পাশ করিতেছিল। শিপ্রাকে লইয়া সে চলিয়া আসিয়াছে। ইন্দ্রনাথের মনের অবস্থা গতরাত্রে শরদিন্দুর চক্ষের সম্মুখে সুস্পষ্ট রূপে ভাসিয়া উঠিতে বাকী ছিল না। এবং এই জন্য তাহারও মনটা গুরুভার পাথরের মতো হইয়া উঠিয়া ছিল।

বাহিরে শরদিন্দু নিজেকে যতোই গোপন করিয়া চলুক্ না কেন, অন্তরে-অন্তরে সে নিজেকে ফাঁকি দিতে পারে নাই। শিপ্রার অজ্ঞাতকুলশীলতা সমাজ ক্ষমা করিবে কি? সে-দরদ্, উদারতা কি ইহার আছে? শরদিন্দুর অর্থের জোর আছে। কিন্তু একা মানুষ কি করিয়া বহুজন বেষ্টিত সমাজের সম্মুখীন হইবে? অর্থের বল্ বড়ো কম বল্ নহে। এ-কথা সারা বিশ্বের সকলেরই জানা আছে। তবু, এই অর্থ-বল্ই যে, সবক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো বল্, তাহাও স্বীকার করিয়া লইতে প্রাণ চাহে না।

অথচ শিপ্রাকে শরদিন্দুর চাই-ই। এই চাওয়ার মধ্যে তাহার এতোটুকু কার্পণ্য নাই। সে চাহিয়াছে তাহাকে, নিজের অন্তর দিয়া।

এতোদিন শরদিন্দু শিপ্রার মনটা লাভ করিয়াই আপনাকে পরম ভাগ্যবান বলিয়া মানিয়া লইয়া ছিল। কিন্তু রক্তমাংসের মানুষের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়া যায় তখন, যখন একটি রক্ত-মাংসের নারীকে অহরহঃ কাছে-কাছে পায়। এখন শুধু মন পাইয়াই শরদিন্দু সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট নয়। শিপ্রার কাছ হইতে আরো কিছুর দাবী সে রাখে।

কাল রাত্রে নানা প্রকার চিন্তা শরদিন্দুর মনে তুফান তুলিয়া

ছিল। আজি উঠিয়াই সে শিপ্রাকে দেখিল। অন্যদিন এমন দেখে না। পা' টিপিয়া আস্তে আস্তে আসিয়া সে তাহার কাঁধে একখানা হাত রাখিয়াছে।

শরদিন্দু শিপ্রার চিবুকের নীচে হাত রাখিয়া তাহার মুখখানি উঁচু করিয়া ধরিল, বলিল, মুখ তোলো, শিপ্রা। আমার দিকে চাও—লক্ষ্মীটি!

শিপ্রা চোখ্ তুলিয়া একবার চাহিল। কিন্তু লজ্জা আসিয়া তাহাকে বিব্রত করিয়া দিল। সে তাড়াতাড়ি দুইহাত দিয়া নিজের মুখখানি ঢাকিয়া ফেলিল।

—ছিঃ, শিপ্রা! মুখ থেকে হাত নামাও। কেন, আমার মুখখানা কি দেখ্‌বার মতো নয়?

বলিতে বলিতে শরদিন্দু জোর করিয়া শিপ্রার হাত দুইখানা নামাইয়া দিয়া হাসিতে লাগিল।

শিপ্রাও হাসিয়া ফেলিল, কহিল, বেলা হ'য়ে যাচ্ছে। পথ ছাড়ো! আমি যাই।

শরদিন্দু সে-কথায় কর্ণপাত করিল না। অকস্মাৎ একটু নত হইয়া শিপ্রাকে চুম্বন করিল।

বাঁশীর করুণ এবং সুমিষ্ট সুর, সজীব পদার্থকেও মুগ্ধ করিয়া তুলে। শরদিন্দুর ওষ্ঠের স্পর্শ শিপ্রাকে ততোধিক মুগ্ধ করিয়া ক্ষণকালের জন্য নড়িবার শক্তি বিলুপ্ত করিয়া দিল। কিন্তু এক সময়ে সে অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া দৌড়াইয়া, ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শিপ্রার যৌবনে এই প্রথম-চুম্বন কি তাহার চোখে আনন্দাশ্রু টানিয়া আনিল?

—দশ—

মুসলমানের কি একটা পর্ব্বোপলক্ষে শম্ভুনাথের অফিস বন্ধ ছিল। বাড়ীতে গৃহিণী বায়না ধরিয়াছেন—এই পর্ব্বেই কালীঘাটের মাংস খাইতে হইবে। শম্ভুনাথ জগতের সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া একা দাঁড়াইতেও বোধকরি পশ্চাৎপদ হন না। কিন্তু ব্রাহ্মণীর বিরুদ্ধে একটা কথা কহিবারও সাহস বোধহয় তাঁহার বুকে নাই। বিশিষ্ট শক্তিশালী ব্যক্তির শরীরকে তিনি ভয় করেন না। তবে গৃহিণীর অস্থি-চর্ম্মসার অবয়বটা যেন তাঁহার কাছে একটা নৃশংস বিভীষিকার প্রতিমূর্ত্তি!

তাই আজ প্রভাতে কালীঘাটে গিয়া শম্ভুনাথ নিতান্তই অনিচ্ছায় একটা ছেটো-খাটো পাঁঠা কাটিয়া বাড়ীতে আনিয়াছেন। ব্রাহ্মণী রন্ধনে দ্রৌপদী নন; তবু মন্দ রাঁধেন না। মাংস রাঁধিবার ভার তিনিই লইয়াছেন।

কিন্তু গোল বাঁধিয়াছে—অতো মাংস খাইবে কে? দুইটি মানুষ। পেটুক বলিয়া ব্রাহ্মণদের একটা অপবাদ আছে। তিন্, চার সের মাংস তাহা হইলেও খাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং শম্ভুনাথ স্থির করিয়া ছিলেন, কাল পর্য্যন্ত রাঁধা-মাংস চালাইবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণী এ-কথা জানিতে পারিয়া একেবারে সপ্তমে চড়িয়া বলিয়াছিলেন, ব'লি হ্যাগা, তোমার আক্কেলটা কি? বাড়ীতে মাংস রাঁধা হ'চ্ছে, ওনা আমার ভাইকে ব'লে এসো না। এখানে

আজ দু'বেলা খাবে। লোকের আবার অভাব গা'? বাশী-মাংস খেতে হবে—মরণ আর কি!

শম্ভুনাথ অগত্যা সম্বন্ধীকে নিমন্ত্রণ করিয়া মিনিট্ কতোক হইল ফিরিয়া আসিয়াছেন।

ছোটো বাড়ী। একদিকে বাড়ীওয়ালা পরিবার লইয়া থাকে। অপরাংশে, অর্থাৎ দুইখানা ঘরে, বসবাস করেন—ব্রাহ্মণ-দম্পতী। ঘর দুইখানি খুব-ই ছোটো। মাটির ঘর। আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। এই ঘর দুইখানির প্রত্যেকটি বড়ো-বড়ো ইঁদুরের গর্ত্তে পরিপূর্ণ। চাল, কলার লোভে ইঁহাদের সংসারে ইঁদুরের উৎপাত বোধহয় বেশী। ঘরের উপরে ছাদ নাই। কড়ি ও বরগার বালাই দেখা যায় না। শুধু মোটা-মোটা দর্মা দিয়া উপরটা ঢাকা। ইহার উপরে স্থানে-স্থানে মাকড়সার জাল। বর্ষার সময় যেমন দর্মা বাহিয়া জল ভিতরে প্রবেশ করে, তেমনি আবার শীতকালে ঠাণ্ডার বহর সহ্যকরা দুরূহ হইয়া উঠে।

ঘরের বাহিরে একটু চাতাল। এইখানে রন্ধনকার্য্য সম্পাদিত হয়।

গাঁজার মতো একটা লম্বা ও সরু কলিকায় শম্ভুনাথ উবু হইয়া তামাক সাজিতে সাজিতে রন্ধন-নিরতা গৃহিণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, শালাকে তো নেমন্তন্ন ক'রে এলুম। এখন ভয় হ'চ্ছে, মাগ্-ছেলে শুদ্ধু এসে হাজির না হয়

ব্রাহ্মণী হাঁড়ির মাংস কষিতে কষিতে ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, শোনো কথা! এলোই বা; তাতে তোমার কী এমন দশ-বিশ টাকা খরচ হবে?

—হবেনা? বলো কি গো? তারা কুটুম্ব। তোমার ঘরের মাটি গুলো খেয়ে ফিরে যাবে নাকি? খামোখা কর্‌করে কতোক গুলো পয়সার শ্রাদ্ধ বইতো নয়!

গৃহিণী পিতলের হাঁড়িটার চারি-পার্শ্বে হাতার সাহায্যে বার-কতোক শব্দ করিয়া বাড়ীওয়ালাদের জানাইয়া দিলেন যে, আজ এই দিকে যজ্ঞির আয়োজন হইতেছে।

শব্দটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া, থামিয়া গেলে কহিলেন, রঙ্গ রাখো। কেন, অভাবটা কি শুনি? যার হাতে বোস্-গুষ্টির যজমানি তার আবার ভাব্‌না—অবাক্ ক'র্‌লে!

শম্ভুনাথ কয়লাতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া ফুঁদিয়া ধরাইলেন। হাত ধুইয়া, কড়ি-বাঁধা ছোটো হুঁকাটার মাথায় কলিকাটা চাপাইলেন। তামাক টানিবার উপক্রম করিতে করিতে বলিলেন, আরে জানোনা—লাখ্ টাকায় বামুন ভিখিরী? আমাদের কী নেই? বাবুদের মতন আশ্রম থেকে সুন্দুরী আইবুড়ো মেয়েই না হয় আমরা আন্‌তে পারিনে, ওদের মতন অপঘাত-গাড়ী না হয় চ'ড়্‌তে পারিনে; কিন্তু তাই ব'লে কি আমরা কিছুর কাঙাল?

এই বলিয়া তিনি হুঁকাতে এমনি জোরে টান্ দিলেন যে, বাকী কয়লাগুলি সম্পূর্ণ ধরিয়া উঠি-উঠি করিতে লাগিল।

গৃহিণী শুনিয়া ছিলেন তাঁহার কর্ত্তার মুখ হইতে, যে শরদিন্দু একটি অজ্ঞাতকুলশীলা যুবতী মেয়েকে ঘরে আনিয়া রাখিয়াছে। এ-সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ কৌতূহল ছিল না। কিন্তু অপঘাত-গাড়ীর নাম ইতিপূর্ব্বে শুনেন নাই। বড়ো বিস্ময় জাগিল!

অপরাধই বা কি? মেয়ে-মানুষ তো! বয়স হইলে কি হইবে? জাতির অনুসন্ধিৎসু যাইবে কোথায়?

স্বামীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, বাবুরা কি গাড়ী চড়ে ব'ল্লে গো? ও—হ্যাঁ মনে প'ড়েছে—অপঘাত-গাড়ী। কিন্তু সে আবার কেমন ধারা গাড়ী গা'? নতুন বেরিয়েছে বুঝি?

শুনিয়া শম্ভুনাথ হুঁকা হইতে মুখ নামাইয়া হো-হো করিয়া, অবিরাম টানিয়া-টানিয়া হাসিতে লাগিলেন। সর্ব্বনাশ! ব্রাহ্মণ পাগল হইলেন না-কি?

কিন্তু না! তিনি হাসির পাগল নন্। সুন্দরী, যুবতী-নারীর সুশ্রী মুখ এবং তনু তাঁহাকে সত্য-ই পাগল করে।

গৃহিণীর অভিমানের এবং অজ্ঞতার সীমা নাই। উনি মনে করিলেন, গাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহার যথেষ্ট নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে—এবং ইহার-ই জন্য স্বামী বিদ্রূপের হাসি, হাসিয়াছেন।

বিনামেঘে বজ্রাঘাত! সহসা গৃহিণী জ্বলন্ত উনান হইতে মাংসের হাঁড়িটা দুম্ করিয়া মাটিতে নামাইলেন। পরমুহূর্ত্তে হাতাখানা টান্ মারিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, আমার সঙ্গে ঠাট্টা? কেন, আমি বাড়ীর দাসী-বাঁদী, না রাস্তার কুকুর, বেড়াল?

শম্ভুনাথের মুখের হাসি ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। উনি ভয়ে এতোটুকু হইয়া উঠিলেন। তামাকের ধোঁয়া সন্তর্পণে গিলিয়া রণচণ্ডী স্ত্রীর দিকে তাকাইলেন। তারপর নি-ই ভয়ে-ভয়ে কহিলেন, তোমার সঙ্গে ঠাট্টা কি আমি করতে পারি?

শরদিন্দুর দিকে না চাহিয়া কহিলেন, কিন্তু কেন বল'তো? —আস্‌ছে অঘ্রাণে একটা বিয়ের শুভ-দিন দেখুন্!

পাওনা-গণ্ডার আশায় শম্ভুনাথ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া কহিলেন, কার বিয়ে বাবা, শরো? কৈ, আমি তো কিছুই জানিনে। তোমাদের বাড়ীতেই কি?

শরদিন্দু হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের বাড়ীতেই। আপনার পাওনার জবড়্ দিন আস্‌ছে।

শম্ভুনাথ বলিলেন, কিন্তু তোমাদের বাড়ীতে বিয়ে কর্‌বার পাত্র তো একা তুমি-ই। মেয়ে দেখা হ'য়েছে তো?

শরদিন্দু এবার গম্ভীরভাবে সংক্ষেপে উত্তর দিল, হ্যাঁ।

শম্ভুনাথ সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলেন, মেয়ে পছন্দ ক'র্‌লে কে, বাবা? আমাকে সঙ্গে নেওয়া তোমার...

শরদিন্দু বাকীটা পূরণ করিয়া দিল। বলিল, উচিত ছিল, কেমন এই তো? কিন্তু পছন্দ জিনিষটা নিজের ঠাকুরমশাই। এটা ধার করা নয়। আর তা'ছাড়া, মেয়ে আমার বাড়ীতেই আছে। তাকে আপনি দেখেছেন।

শম্ভুনাথ এখন মনে মনে বুঝিলেন, পাত্রীটি কে? তবু অবুঝের মতো কহিলেন, দেখেছি—কোথায় বল'তো?

—কেন, আমাদের বাড়ীতে। যার প্রণাম আপনি সন্তুষ্ট মনে নেন্‌নি!

শম্ভুনাথের বুঝিতে বাকী রহিল না, সে-দিনের আচরণটা শরদিন্দুর কর্ণগোচর হইয়াছে। মনে মনে পাত্রীর মুণ্ডপাত

করিয়া নিজেকে গোপন রাখিয়া বলিলেন, না, না—তা' কেন, তা' কেন! তোমাদের 'পর কি আমার অসন্তোষের কারণ থাকৃতে পারে?

এই বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, এতো বড়ো বংশের ছেলে হ'য়ে তুমি একটা অজ্ঞাতকুলশীলা মেয়েকে বিয়ে ক'র্‌বে? বাংলাদেশে কি সুন্দরী মেয়ের দুর্ভিক্ষ লেগেছে বাবা?

এই উপদেশ-বাক্যে শরদিন্দুর মুখাকৃতি নিরতিশয় গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল। দুই, তিন মিনিট্ ব্রাহ্মণের আপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, বাংলাদেশে মেয়ের বন্যা ব'হে যাচ্ছে, এ আমিও জানি ঠাকুরমশাই! কিন্তু সেই বন্যার স্রোতের থেকে কুড়িয়ে নেবার মতো বাধ্যতা আর যার-ই থাকৃনা কেন, আমার নেই। মানুষের কুলটাই কি সব চেয়ে বড়ো ঠাকুরমশাই? মনের কি কোনো দাম্ নেই?

শম্ভুনাথ বসিয়া শুনিলেন। পরে পরম বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিতে লাগিলেন, বাপু হে, তোমরা ছেলে-ছোক্‌রা। জাত-টাত তোমরা মানো না। পৈতৃক টাকায় ব্যাঙ্ক আর বাড়ীর সিন্দুক তোমার ভর্ত্তি! সুতরাং, টাকার জোরে তুমি 'না' কে 'হ্যাঁ' তে পরিণত ক'র্‌তে পারো। এ আমি অস্বীকার ক'রিনে। কিন্তু আমরা বুড়ো মানুষ, তায় ব্রাহ্মণ—নিজেদের মান-সম্ভ্রম আছে, তো? এই ধরোনা, তোমার বিয়েতে যদি আমি পৌরহিত্য ক'রি, তবে গিয়ে আমার আখেরটা নষ্ট হ'য়ে যাবে না? আরো দশ-বিশটা যজমান্ আছে

তো—তুমি তো আমার একটি নও। তারা, পরে আমায় ডাক্‌বে কেন?

শরদিন্দু উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, ঠাকুরমশাই আপনি আমার বাবার আমলের পুরুত—তাই এর জন্যে আপনার কাছে এসে ছিলুম। এখন দেখ্‌ছি, আমার আসাটাই হ'য়েছে সবচেয়ে মূর্খতার পরিচয়। আর মান-সম্ভ্রমের কথা ব'ল্‌ ছিলেন না? কিন্তু সেটা যদি আপনার কণামাত্রও থাক্‌তো, তবে মানের কথা নিয়ে নিজেকে আজ এতো ছোটো ক'র্‌তেন না। বোস্‌-গুষ্টির সবাইকে আজ জানিয়ে দেবেন—শুভকাজে কোনো রকম সহায়তা আমি আপনার চাইনে। আচ্ছা, আসি তবে।

এই বলিয়া শরদিন্দু নামিয়া দুই পদ অগ্রসর হইতেই কি মনে করিয়া, ফিরিয়া দাঁড়াইল। পকেট হইতে খান কয়েক দশটাকার নোট চাতালের উপর রাখিল, কহিল, এই টাকা ক'টা তুলে রাখুন্‌। ঘরের অবস্থাটা ফিরিয়ে একটু মান—সম্ভ্রম বজায় রাখ্‌বেন।

বলিতে বলিতে সে বাহির হইয়া মোটরে উঠিল।

চক্ষুর সম্মুখে অবস্থিত নূতন নোট গুলি ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণীর মনে লোভ জন্মাইয়া দিল। শম্ভুনাথ স্ত্রী হইতে কিছু দূরে ছিলেন। তাঁহার যথাস্থানে পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব হইল। ইত্যবসরে স্ত্রী থপ্‌ করিয়া নোট গুলি তুলিয়া আঁচলে বাঁধিতে সুরু করিলেন। আসিয়া বিনীত ভাবে কহিলেন, বাঃ! বেশ মজার লোক তো তুমি? ওম্‌নি নোট গুলো আঁচলে গেরো দিয়েছো! দাও, বাক্সে তুলে রাখি। আজকের দিনটা মন্দ গেলোনা দেখ্‌ছি!

বলিয়াই নিজের হাতখানা স্ত্রীরদিকে প্রসারিত করিয়া দিলেন।

স্ত্রী হটিবার পাত্রী নহেন। অঞ্চলটা কোমরে দুইপাক দিয়া বাঁধিলেন। তাহার পর মাংসের হাঁড়িতে ঘটি চার-পাঁচ জল ঢালিয়া দিয়া স্বামীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, অতো আব্দার কেন? মনে নেই, আমার কাছ থেকে গেলো বছরে একশোটা টাকা ধার নিয়ে ছিলে? লজ্জা করে না চাইতে? এ-টাকা তুমি পাবে না!

শম্ভুনাথ প্রমাদ গণিলেন। এতো গুলি টাকা হাতছাড়া হইয়া যাইবে?

ভাবিয়া চিন্তিয়া স্নেহ-জড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, আ-হা-হা; ব'লি চটো কেন গা'? ঠাট্টাও কি বোঝনা নাকি? আমার টাকা কি তোমার টাকা নয়? না, তোমার টাকায় আমার কোনো অধিকার নেই? তা' সে-কথা যাক্। একবার গুণে দেখি, ছোঁড়াটা কতো টাকা দিয়ে গেলো? লক্ষীটি, একবার আঁচলটা খোলো!

গৃহিণী দাঁত বাহির করিয়া অশোভন মুখ-ভঙ্গী সহকারে কহিলেন, থাক্! অতো সোহাগে কাজ নেই! ভারী ধূর্ত্ত তুমি বটে? টাকা গুলো গুণ্‌তে নেবার ছলে, নিজের পকেটে প'ড়্‌বে। কিন্তু আমিও মুখুয্যে-বাড়ীর মেয়ে! চালাকীতে ঠক্‌ছিনে।

টাকার লোভ, ভারী লোভ। তাহার উপর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্প্রতি মনে মনে স্থির করিয়া ছিলেন, এবার চায়ের কিম্বা

ডাইংক্লিনিংয়ের দোকান খুলিবেন। কোথায় হইতে শুনিয়া ছিলেন, এই দুইটা ব্যবসা-ই নাকি আজকাল কলিকাতার টাকা লুটিয়া লইতেছে। তাঁহার ব্যবসায়ী বুদ্ধি আছে। লোক ঠকাইবার কল-কৌশলও অজ্ঞাত নহে। সুতরাং বড়ো লোক হইবার স্বপ্ন তিনি জাগিয়া দেখিতে ছিলেন। কিন্তু মজা এই যে, ঘরের টাকা বাহির করিতে তিনি চাহেন না। আজ অপ্রত্যাশিত রূপে টাকা কয়টা যখন আসিয়া পড়িল, তখন স্ত্রীর অঞ্চলে স্থান পাইবে? এ নিতান্তই অসম্ভব। ভট্টাচার্য্য মহাশয় মরীয়া হইয়া উঠিলেন।

মানুষ যখন মরীয়া হইয়া উঠে, তখন স্বাভাবিক সাহস এবং সামর্থ্য—এই দুইটার স্থান অধিকার করিয়া বসে, অস্বাভাবিক সাহস ও সামর্থ্য। স্ত্রীকে ভয় করিয়া চলা শম্ভুনাথের স্বভাবজাত ধর্ম্ম! কিন্তু টাকা তাঁহাকে পাগল করিয়া তুলিল। পাগল হইলে মানুষ অসাধ্য সাধনও করিয়া থাকে।

পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা সত্ত্বেও যখন টাকা শম্ভুনাথের হাতে আসিল না, তখন তিনি স্ত্রীর অঞ্চল ধরিয়া টান্ দিলেন। অঞ্চল কোমরের সহিত ভালো করিয়া বাঁধা ছিল, খুলিল না। কিন্তু ইহাতে ফল হইল—বিপরীত। ব্রাহ্মণীর পাৎলা কাপড়ের একাংশ ছিঁড়িয়া যাইতেই তিনিও ক্ষেপিয়া উঠিলেন। দুইহাত দুইদিকে প্রসারিত করিয়া চীৎকারে বাড়ী মাথায় করিয়া কহিলেন, দেখ্‌লি একবার মিন্‌সের কাণ্ডটা? আমার নতুন শাড়ীটা টেনে ছিঁড়ে দিলে!

বলিয়া তিনি রক্তচক্ষু শাড়ীখানার পানে চাহিয়া পুনশ্চ সুরু করিলেন, কেনে দেবার মুরদ্ তো দেখি না। ছিঁড়্‌তে

আমার গায়ে হাত ওঠে—কেমন? ব'লি এটা কি তুমি কিনে দিয়ে ছিলে? তুমি রোশো একবার। আমি কেমন বাপের বেটি, আর তুমি কেমন বাপের ব্যাটা, দেখা যাবে।

শম্ভুনাথ আজ যাহা হয় একটা করিবেন-ই। চাতাল হইতে হুঁকাটা তুলিয়া হাতে লইলেন, লইয়া স্ত্রীর মুখের উপর বার্‌দুই তিন হুঁকাসমেত হাতটা কাঁপাইয়া বলিলেন, ওসব বাজে কথা আমি শুন্‌তে চাইনে। ভালোয় ভালোয় টাকা কটা বার্ ক'রে দাও; নইলে, এই হুঁকো তোমার পিঠে প'ড়্‌বে।

—কী, মার্‌বে? আমাকে মারা? স্ত্রীর গায়ে হাত? ওমা কোথায় যাবো গো? তোমরা দেখ্‌বে এসো, মিংসে আমাকে খুন্ ক'র্‌লে গো!

বলিতে বলিতে গৃহিণী চট্ করিয়া ভট্টাচার্য্যের হাত হইতে হুঁকাটা কাড়িয়া লইয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। এবং পরমুহূর্ত্তেই পায়ের কাছের জলের ঘটিটা হাতে তুলিয়া লইয়া নিজের কাপালে মারিয়া, কপাল ফুলাইয়া ফেলিলেন।

চীৎকার শুনিয়া বাড়ীওয়ালী আসিয়া ঘটনা স্থলে দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেখিয়া শুনিয়া তিনি শম্ভুনাথকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, একি ব্যাপার ভটচাজ্ মশাই? স্ত্রীকে ধ'রে মারেন? ভদ্র লোকের বাড়ীতে এসব কী বেআক্কারীরে বাবা!

শম্ভুনাথ থ'। নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবেন কি, তাঁহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। ব্যাপার সুবিধাজনক নহে। ভট্টাচার্য্যমহাশয় ধীরে ধীরে সে-স্থান ত্যাগ করিয়া, বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

— এগারো —

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। এখনো শরদিন্দু আজ বাড়ী ফিরিয়া আসে নাই। বেড়াইতে বাহির হইতে অন্যদিন অপেক্ষা কিছু বিলম্ব হইয়া ছিল।

শিপ্রা শরদিন্দুর শয়ন-কক্ষে বসিয়া কি একখানা পুস্তক পড়িবার বৃথা চেষ্টা করিতে ছিল। শরদিন্দুর আগমন সে প্রতি-মুহূর্ত্তে প্রতীক্ষা করিতেছে।

পুস্তকখানা বন্ধ করিয়া শিপ্রা উঠিয়া দাঁড়াইল। খাটের মাথার দিকে শরদিন্দুর একখানা বাষ্ট-ফটো সুন্দর ফ্রেমে বাঁধাই করা অবস্থায় দেওয়ালে শোভা পাইতে ছিল। ইহার উপরে তিন ডালের লাইটের ঝাড়ের আলো। উজ্জ্বল আলোকে ছবিখানা কী সুন্দরই না দেখাইতেছে! ঘরে আরো ছবি রহিয়াছে, কিন্তু কোনোটাই শরদিন্দুর মতো নহে। এ-খানা তাহার আশ্রমে যাইবার পূর্ব্বকার ছবি। কতো আর তখন বয়স হইবে? বড়ো জোর, একুশ-বাইশ। শিপ্রা ছবিখানার তলায় আসিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া স্থির-দৃষ্টিতে উহার দিকে চাহিয়া রহিল।

শরদিন্দু কখন নিঃশব্দে [illegible] আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, শিপ্রা জানে না। সহসা দুইখা[illegible] ব্যায়াম-পুষ্ট শক্ত হাত তাহার কাঁধের উপর দিয়া ঘুরিয়া [illegible] দুইটা চাপিয়া ধরিতেই সে চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। শরদিন্দু মৃদু-মৃদু হাসিতেছে।

—ছিঃ! কেউ দেখে ফেলে যদি?

—ভয় নেই। কিন্তু সে যাক্। আমার ছবিখানার দিকে অমনে কি দেখ্‌ছিলে, শিপ্রা? আমার চেয়ে, আমার ছবিখানা বুঝি তোমার কাছে প্রিয় হ'য়ে উঠ্‌লো?

—আমার কাছে তুমি আর তোমার ছবি, সমান প্রিয়। যাকে রক্তমাংসে ভালোবাসা যায়, তার জড় প্রতিমূর্ত্তিটাও উপেক্ষার নয়। ওকেও আমি ভালোবাসি!

শরদিন্দু খুশী হইয়া উঠিল। শিপ্রার মাথার খোঁপাটা অকারণেই টানিয়া খুলিয়া দিল, দিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, উঃ! তোমার চুল কী লম্বা, শিপ্রা! একেবারে হাঁটুর নীচে প'ড়েছে। দেখো তুমি—ঐ আয়নাটার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে। আমি একটুও মিথ্যে ব'ল্‌ছিনে।

—আঃ! কী যে করো তার ঠিক্ নেই। দেখো দেখি চুল নিয়ে এতো রাত্রে আমায় আবার ব্যতিব্যস্ত হ'তে হবে!

এই বলিয়া শিপ্রা গম্ভীর হইতে গেল, কিন্তু পারিল না। হাসিয়া ফেলিল, বলিল, রাত্রি ক'টা বাজ্‌লো খেয়াল নেই বুঝি? চ'লো খেতে! তোমার জন্যে আমাকেও না খেয়ে থাক্‌তে হ'য়েছে।

—আরে তাই নাকি? সে-কথা আগে ব'ল্‌তে হয়। চলো চলো—শীগ্‌গির চলো।

আহারাদি সারিয়া শরদিন্দু এবং শিপ্রা উভয়েই সোপান বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। শরদিন্দু বারান্দা হইতে মুখ বাড়াইয়া দ্বারবান গোলাপ-সিংকে লোহের ফটক্ চাবি দিতে বলিয়া দিল।

জ্যোৎস্নাপক্ষ। চন্দ্রের কিরণ নীম্নভূমিতেও রূপের স্রোতস্বিনী বহাইয়া দিতেছে!

শিপ্রা শরদিন্দুর একখানা হাত নিজের হাতের মুঠির মধ্যে কিছুক্ষণ চাপিয়া রাখিয়া, ছাড়িয়া দিল। শরদিন্দু তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, কিছু ব'লবে?

শিপ্রা মুখ নত করিয়া কহিল, বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? তার চেয়ে বরং ছাদে যাই চলো। মুক্ত আকাশকে মুক্ত জয়গায়-ই উপভোগ করা যাবে।—যাবে?

—চলো। সেই ভালো।

* * * *

শিপ্রা কহিতে লাগিল, আশ্রমে থাক্‌তে কতোদিন এমনি জ্যোৎস্না-রাত্রে মাঠের ওপর ঘুরে বেড়িয়েছি। প্রকৃতির শোভা সেখানে যা' উপভোগ ক'রেছি—সে তো তুমিও জানো। কিন্তু এখানে যে-আনন্দ পাচ্ছি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থেকে, সেখানে তো এমনটি পাইনি! কালিদাসের শকুন্তলা কণ্বমুনির তপোবনে থেকে প্রকৃতি ও জীবজন্তুর সঙ্গে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ছিল। তারপর তার দুষ্মন্তর প্রাসাদে যাবার আগ্রহ কতোই না বড়ো হ'য়ে দেখা দিয়ে ছিল! তপোবনের যে-গাছটি, যে-ফুলটি, পাখীটি, জীবজন্তু পর্য্যন্ত শকুন্তলার প্রিয় ছিল, তাদের ত্যাগ ক'রে যাবার মধ্যে যতো বেদনাই থাকুনা কেন, দুষ্মন্তর সাহচর্য্য পাবার কামনা তাকে কি কম আনন্দ দিয়ে ছিল?

—মোটেই না। এ-থেকে সহজেই প্রমাণ হ'চ্ছে যে, নারীর বিয়ে ছাড়া অন্য উপায় নেই। আশ্রমই বলো, আর তপোবনই

লো, সবই প্রেমের আগুনে পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যায়। তপোবনে ঋষিমুনি শকুন্তলাকে পালন ক'রে ছিলেন। পুরুষের সাহচর্য্য সে জান্‌তো না। কিন্তু তবু, প্রেম এসে যখন তাকে বিমনা ক'রে দিলে, তখন সে দুর্ব্বাশার অভিশাপ গ্রহণ ক'র্‌লে!

ছাদের একপার্শ্বে পাশাপাশি দুইখানা ইজিচেয়ার পড়িয়া ছিল। একখানার উপর বসিয়া শিপ্রা কহিল, প্রেমের দাহ-শক্তি নেই। অমৃতের মতোই এ মধুর এবং শীতল। মনের যে-সব গ্লানি থাকে, প্রেমের আবর্ত্তনে সে-সব ধুয়ে-মুছে যায়। আমি এলুম, তোমার সঙ্গে চ'লে। যিনি স্নেহ দিয়ে আমায় এতো বড়োটি ক'র্‌লেন তাঁর দৃষ্টির বাইরে আস্‌তে কি আমার কষ্ট হয় নি? খুবই হ'য়েছে। কিন্তু সে ভুলেছি শুধু তোমার জন্যে। আমরা যাকে চাই, তাকে একান্তই চাই।

শুনিয়া শরদিন্দু চুপ্ করিয়া শিপ্রার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর পার্শ্বের ইজিচেয়ারে বসিয়া বলিল, গুরুদেব আমাদের কী ভালোই না বাস্‌তেন! বোধকরি আমাদের দু'জনের একসঙ্গে এমনি সংগোপনে পালিয়ে আসাতে তাঁর মন বেদনা-সাগর হ'য়ে উঠেছে। একদিন আশ্রমে যাবে, শিপ্রা?

চন্দ্রের আংশুমালায় শরদিন্দুকে অতি সুন্দর দেখাইতে ছিল। শিপ্রা তাহার একখানা হাত নিজের কোলের উপর তুলিয়া লইল, বলিল, বাবা কি আমাদের ক্ষমা ক'র্‌তে পার্‌বেন? না, আমরা যাবো না। এখানে আমরা বেশ আছি! ওখানে গেলে তিনি যদি আমাদের ভিন্ন-দৃষ্টিতে দেখেন? তবে যে আমি একটুও

শাস্তি পাবো না। তার চেয়ে তাঁর অন্তরালে থেকে নিজের দোষ স্বীকার ক'রে থাকা শাস্তির বিষয়।

শরদিন্দু হাতখানা শিপ্রার কোল হইতে ধীরে ধীরে তুলিয়া তাহার এলোচুলের রাশিতে বুলাইতে বুলাইতে কহিল, না শিপ্রা, তিনি তেমন লোকই নন্। সাধারণ লোক হ'তে গুরুদেব যে কতো উঁচু, তা' কি তুমি জানো না? আমরা তাঁর পায়ে অপরাধ ক'রেছি, কিন্তু তিনি যে সব সময়েই আমাদের মাথার মণি।

একটুখানি নীরব থাকিয়া কহিল, আমাকে আশ্রমে একবার যেতে হবে, শিপ্রা। তোমাকে গুরুদেবই আমার হাতে তুলে দেবেন। তাঁর উচ্চারিত মন্ত্রের সাহায্যে যে তোমার-আমার মিলন পুণ্যময় হ'য়ে উঠ্‌বে! তাঁকে ছাড়া তো আমার এখন চ'ল্‌বে না!

শিপ্রা জানিত, ইন্দ্রনাথ তাহার বিবাহের পক্ষ-পাতী নহেন। চির-কুমারী করিয়া অমরাবতী-আশ্রমে রাখিবার তাঁহার অন্তরের অভিলাষ। কিন্তু শরদিন্দুর ইহা অজ্ঞাত ছিল। ইন্দ্রনাথ এই অভিলাষ তাহাকে বলেন নাই।

শিপ্রা আজো সে-সম্বন্ধে কোনো কথাই শরদিন্দুকে বলিল না। কহিল, কেন, আমাদের ঠাকুরমশাই তো আছেন! তাঁর দ্বারা তো আমাদের বিয়ের কাজ সম্পাদিত হ'তে পারে!

—পারে। কিন্তু তিনি এ-বিয়েতে পৌরহিত্যের কাজ ক'র্‌বেন না। ক'র্‌লে, তাঁর নাকি মান-সম্ভ্রম নষ্ট হবে।

—কেন? মান-সম্ভ্রম নষ্ট হবে কেন?

—কারণ—তুমি অজ্ঞাতকুলশীলা!

—অজ্ঞাতকুলশীলা!

কথাটা শিপ্রার মুখ হইতে অজ্ঞাতসারেই একবার বাহির হইয়া আসিল। এবং কয়েক মুহূর্ত্ত পরে শরদিন্দু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইল—শিপ্রার দুই চোখ্ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

—শিপ্রা! একি,—তুমি কাঁদ্‌ছো?

শিপ্রা কোনো কথা কহিল না। শরদিন্দুর মুখ-প্রতিও চাহিল না। কেবল আনতমুখে তাহার পায়ের দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া, বসিয়া রহিল। কিন্তু যে-অশ্রু এতক্ষণ সঞ্চিত হইয়া ছিল, এখন তাহা ঝর্ ঝর্ করিয়াই, ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

শরদিন্দু যারপর নাই ব্যথিত হইয়া উঠিল। কথাটা শিপ্রার কানে না তুলিলেই যেনো ভালো হইত। সে হাত দিয়া শিপ্রার মুখখানা নিজের দিকে ফিরাইয়া কোঁচার খুঁটের সাহায্যে চক্ষের অশ্রু মুছাইয়া বলিল, কেঁদোনা, শিপ্রা!

এই বলিয়া সে শিপ্রার হাত ধরিয়া কহিল, নীচে চলো। কার্ত্তিকের হিম্ তুমি সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বে না।

বলিতে বলিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

শিপ্রা আপত্তি করিল না, উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং শরদিন্দু তাহার একখানা হাত ধরিয়া অগ্রসর হইতেই শিপ্রা দাঁড়াইল, বলিল, একটা কথা রাখ্‌বে?

শরদিন্দু শিপ্রার হাতখানা শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল। তাহার আশঙ্কা হইতে ছিল, বুঝিবা সে তাহার কাছ হইতে দূরে সরিয়া যাইবে। কহিল, রাখ্‌বো।

তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিয়া ছিল।

শিপ্রা বুঝিল, আজ এমনি চাঁদ্‌নীরাতে, মুক্তবায়ুতে যে-কথ তাহার মুখ হইতে নির্গত হইয়া আসিবে, সে-কথা সহ্য কর. শরদিন্দুর পক্ষে নিতান্তই কষ্টকর হইয়া উঠিবে। সেকথা তো সহ্য করা নহে, যেনো তাঁহার বুকের পাঁজর খসিয়া পড়া! কিন্তু শিপ্রাকে যে বলিতেই হইবে। নারীর অজ্ঞাতকুলশীলতা কোন্ নারী নির্ব্বিবাদে সহ্য করিতে পারে?

—আমাকে আশ্রমে পাঠিয়ে দাও!

—আশ্রমে পাঠিয়ে দোবো—কেন শিপ্রা?

শিপ্রা নিজের হাতখানা শরদিন্দুর হাত হইতে মুক্ত করিয়া লইল, কহিল, আমি যাবো! এই প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে, অতুল ঐশ্বর্য্যের ভেতরে আমি যেনো বন্দী হ'য়ে আছি। আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ছে। আশ্রমের সেই শ্যামল-মূর্ত্তি, সেই ছোটো-বড়ো মেয়েদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মেলা-মেশা করা, কারুর অধীনে না থেকে স্বাধীনভাবে বেড়িয়ে বেড়ানোই আমার ভালো। আমাকে পথের 'পর থেকে কুড়িয়ে নিয়ে মানুষ ক'রেছেন আশ্রমে। নিজের জন্মের সম্বন্ধে কিছু জানিনে। কিন্তু এখানে আস্‌বার আগে পর্য্যন্ত কেউ এ-কথা নিয়ে আলোচনা করেনি। অমরাবতী-আশ্রম লোকের কুল, জন্ম [illegible] কোনো দিনই বিচার করেনা।

তাহার দুই চক্ষু পুনরায় বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল।

শরদিন্দু ক্ষণকালের জন্য তাহার মুখের পানে অভিভূত-চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, বাইরের লোককে নিয়ে তো আমাদের কোনো কাজ নাই, শিপ্রা! যারা দৈনন্দিন তোমার কথা নিয়ে

ালোচনা করে, তারা তোমার অনুগ্রহের পাত্র, তুমি াদের নও।

শিপ্রা এ'কথার উত্তরে কিছু বলিল না। কহিল, আমার জন্যে তুমি নিজের অনিষ্ট ক'রো না। তুমি বড়ো লোক, তোমার মান, বংশমর্য্যাদা, সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্য—সবই নারীর কাম্য! আমি গত জন্মের পুণ্যফলে তোমার ভালোবাসা পেয়েছি। কিন্তু আমার যে তা' সইবে না। আমি রাহুর মতো গোপনে অমৃত-পান ক'রে ছিলুম।

বলিয়া সে মুহূর্ত্তমাত্র মৌন থাকিয়া বলিল, তুমি নিজের স্তরের মেয়েকেই বিয়ে ক'রো। আমাকে ছেড়ে দাও—আমি আশ্রমে ফিরে যাবো।

নিজেকে প্রাণ-পণে সংযত করিয়া শরদিন্দু কহিল, যারা জন্মান্ধ তাদের দুঃখ আছে। কিন্তু যারা জন্মে ছিল চেখের দৃষ্টি নিয়ে, পরে দৃষ্টি হারিয়ে ফেলে যে-দুঃখ তারা অনুভব করে, সেটা কি জন্মান্ধর চেয়ে বেশী নয়? আমি যখন তোমাকে দেখিনি, তখন আমার সংসারী হবার তিলমাত্রও আকাঙ্ক্ষা ছিলনা। তাইতে তো, আশ্রমে গেছলুম।

এই বলিয়া একটুখানি চুপ্ ক'রে থাকিয়া আবার বলিতে লাগিল, কিন্তু এখন আমার সে-আকাঙ্ক্ষা বাড়ী থেকে চ'লে গিয়ে সন্ন্যাসী হবার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে অনেক বেশী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তোমাকে হারালে আমার জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো পাথরের মতো নীরস হ'য়ে দেখা দেবে। তুমি হয়তো এর প্রতিবাদে ব'লবে, আমার দুঃখ কি, অভাব- বা কি?

এর উত্তরে আমি ব'লি, মানুষের ঐশ্বর্য্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং বস্তু নয়! দারুণ পিপাসায় জলপান ক'রে তৃষ্ণা নিবারণ হয়, মানুষে শান্তি পায়। তাইতো জলের এতো আদর। সেই রকম আমার,—অর্থ, বাড়ী, ঘর-দোরের 'পর আমার মায়া-মমতা, আদর-যত্ন থাকবে, যদি তোমাকে আমার সহধর্ম্মিণীরূপে পাই। নইলে, যাদের সব কিছুই থাকতে, সব কিছুতেই নিদারুণ অভাব অনুভূত হয়, তাদের দলের মধ্যে আমাকে খুঁজে পেতে দেরী হবে না।

শরদিন্দু বেদনার প্রাবল্যে সঙ্গত-অসঙ্গত অনেক কথাই বলিয়া গেল। শিপ্রা মনোযোগ সহকারে শুনিল কি না জানি না। তাহার অন্তরে কী একটা অব্যক্ত নারীসুলভ অভিমান এবং আভিজাত্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া অস্থির হইয়া উঠিতে ছিল। একদিন নিশুতি রাত্রে সে-ই স্বেচ্ছায় শরদিন্দুর সহিত চলিয়া আসিয়া ছিল। কয়েক মিনিট্ পূর্ব্বেও যে-আকাঙ্ক্ষা তাহার বুকের ভিতরে নিবিড়ভাবে অবস্থান করিয়া ছিল, তাহাও কিরূপে নিমেষেই অন্তর্হিত হইয়া গিয়া, আশ্রমে ফিরিয়া যাইবার স্পৃহা তাহার অন্তরে ব্যাকুলতা দেখা দিল—বোধকরি ইহার সুনির্দ্দিষ্ট হেতু সে-ও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হয় নাই।

শরদিন্দু নিজের গায়ের চাদরটা শিপ্রার গায়ে জড়াইয়া চুপ্ করিয়া, দাঁড়াইয়া রহিল। সিঁড়ির চাতালের বড়ো ঘড়িটায় ঠং করিয়া একটা বাজিয়া গেল। ঘড়ির বাদ্য দুইজনের কানেই গিয়া ছিল। শিপ্রা কথা কহিল, বলিল, নীচে চলো। অনেক রাত্রি হ'য়েছে।

শরদিন্দু কথাটা শুনিয়াও শুনিল না। বলিল, তা' হ'লে, কি ঠিক্ ক'র্‌লে, শিপ্রা?

শিপ্রা সংক্ষেপে শুধু কহিল, আমি যাবো।

—যাবে?

বলিয়া শরদিন্দু শিপ্রা হইতে দূরে সরিয়া আসিল, এবং আকাশের পানে মুখ ফিরাইয়া সেদিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, বেশ, তাই হোক্! তুমি স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে এসে ছিলে, আবার তোমারই ইচ্ছায় সেখানে পাঠিয়ে দোবো। তবে, তোমার কাছে আমার অনুরোধ, যদি কখনো ফিরে আস্‌বার মন যায়, আমার কাছেই ফিরে এসো।

ছাদ্ হইতে নামিয়া আসিয়া শরদিন্দু ঘরে ঢুকিয়া, বিছানায় শুইয়া পড়িল। শিপ্রা মশারীটা নত হইয়া পরিপাটি করিয়া খাটের সহিত গুঁজিয়া দিল। দিয়া অবনতমুখে শাড়ীর একপ্রান্ত অকারণেই নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

শরদিন্দু মশারীর ভিতর হইতে তাহা দেখিয়া ও-পাশ ফিরিয়া কহিল, শোওগে যাও। আজ রাত্রিটা বইতো নয়। কালই তুমি যেয়ো।

শিপ্রা নিরুত্তরে আলোর সুইচ্‌টা টিপিয়া আলো নিবাইয়া নিঃশব্দে ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার অন্ধকারের মধ্যে অনুমানে শরদিন্দুর খাটের দিকে চাহিয়া এবার সে ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পরদিন প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া শরদিন্দু ঘরের বাহিরে আসিতে দেখিল, শিপ্রা চৌকাঠের উপর মাথা রাখিয়া সিমেণ্ট-করা ঠাণ্ডা মেঝের উপর জড়সড় হইয়া নিদ্রা যাইতেছে। মুখের চেহারা দেখিয়া তাহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, শিপ্রা গতরাত্রে নিজের মনের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া অবশেষে ক্লান্ত-শ্রান্ত চিত্তে ভোরের দিকটায় নিদ্রালু হইয়া পড়িয়াছে।

শরদিন্দুর প্রাণে আঘাত লাগিল। এমনি করিয়াই কি বিদায়ের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়? যদি ঠাণ্ডা লাগিয়া তার শক্ত একটা অসুখ হইয়া পড়ে?

শরদিন্দু বিচলিত হইয়া সন্তর্পণে শিপ্রার কপালটার উপর একখানা হাত রাখিল। রাখিয়া তাহার মনের দুশ্চিন্তার ধারা একটু প্রশমিত হইল।

শিপ্রাকে পাঁজা-কোলা করিয়া খাটের উপর শুয়াইয়া দিলে হয় না? কিন্তু যদি সে জাগিয়া উঠে? ছিঃ! সে-যে বড়ো বিশ্রী ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে!

ভাবিয়া চিন্তিয়া শরদিন্দু খাট হইতে নিজের মাথার বালিশটা আনিয়া শিপ্রার মাথার তলায় রাখিল সন্তর্পণে। তাহার পর একখানা চাদর দিয়া সযত্নে দেহটা আবৃত করিয়া দিল। ভোরের দিকটায় বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। শিপ্রার ঠাণ্ডা লাগিতে পারে তো?

ঘণ্টা-দুই পরে শরদিন্দু যখন বাহিরের বৈঠকখানায় বসিয়া জমিদারী কাগজপত্র দেখিতে ছিল, শিপ্রা ঘরে প্রবেশ করিল।

তাহার বাঁ-হাতে একখানা রূপার রেকাবি। তাহাতে স্বকৃত মোহনভোগ এবং খানকয়েক গরম লুচি। ডান-হাতে একটা মোটা কাচের গ্লাস, তাহাতে সুনির্ম্মল পানীয়।

শিপ্রা নিঃশব্দে টেবিলটার উপর হাতের রেকাবি এবং লের গ্লাস নামাইয়া রাখিল। শরদিন্দুর হাতের কাছে াগাইয়া দিয়া বলিল, নিজেই তোমার খাবার তৈরী ক'রেছি। নি সকালে লুচি খাওয়া তোমার অভ্যাস নয়, তবু, আজ যাবার দিনে এটুকু না ক'রে পারলুম না। কাল, সারা রাত্রি চক্ষে পাতায় ক'রিনি। কি জানি কেন, আমার বুকের ভেতরটা কেমন ক'রে উঠে ছিল।

এই অবধি বলিয়া সে ক্ষণকাল অধোমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, পরে এক সময়ে সহসা মুখ তুলিয়া পুনশ্চ কহিল, ভোরের দিকটায় চোখের পাতা জুড়ে এলো। কখন ঘুমিয়ে প'ড়েছি, ব'ল্‌তে পারিনে। যখন ঘুম ভাঙ্গলো, নিজের দিকে তাকাতেই দেখ্‌লুম, গায়ে একখানা চাদর চাপা। উঠে ব'স্‌তে চোখ্ প'ড়্‌লো—মাথার বালিশটার 'পর। গত রাত্রে এ-সব কিছুই আমার কাছে ছিল না। আজ কালে দেখে বুঝ্‌তে দেরী হ'লো না, আমার এমন যত্ন কর্‌ লোকটি কে!

শরদিন্দু অপলক-চক্ষে শিপ্রার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, শিপ্রা, সত্যি তুমি যাবে?

শিপ্রা অন্য দিকে মুখ করিয়া ঘাড় নাড়িল মাত্র। কথা কহিল না। বোধকরি, তাহার কণ্ঠ বেদনার আতিশয্যে রুদ্ধ হইয়া আসিয়া ছিল!

— বারো —

শিপ্রাকে ফিরাইয়া আনিবার কথা ইন্দ্রনাথের মনে যে আসে নাই তাহা নহে। দিন কতোক অকুণ্ঠ প্রয়াসও করিয়া ছিলেন। কিন্তু শিপ্রা কোথায় গিয়াছে, ঠিক্ জানিতেন না। শরদিন্দুর নিজের সম্বন্ধে ব্যতীত, ইন্দ্রনাথের তাহার আর কিছুই জানা ছিল না। তাহার বাড়ীর এবং অন্যান্য বিষয় ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। মনে করিলেন, শিপ্রাকে লইয়া সে কোনো একটা দূর-দেশে চলিয়া গিয়াছে।

অমরাবতী-আশ্রম হইতে শরদিন্দু শিপ্রাসহ চলিয়া আসিবার পর, আশ্রমের সব কিছুর ভার বহন করিয়া লইয়াছে—কল্পনা। পূর্ব্বে যেমন রীতি, নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতি চলিয়া আসিতে ছিল, এখনো সেই প্রকারই চলিয়া আসিতেছে, এতোটুকু কম বেশী হয় নাই। কিন্তু অভাব হইয়া পড়িয়াছে, আন্তরিকতার। ইন্দ্রনাথ এখন অনেকটা কলের পুতুলের ন্যায় চলিয়া ফিরিয়া বেড়ান। এবং ইহার কৃত্রিমতার মতো তাঁহাকে নড়ন-চড়নের সামর্থ্য দিতেছে বটে, কিন্তু প্রাণের অভাব সম্পূর্ণ অনুভূত হয়—সর্ব্বক্ষণ। এতোদিন ইন্দ্রনাথ শিপ্রা এবং শরদিন্দুকে কাছে রাখিয়া ভুলিয়া ছিলেন, এখন তাহাদের অভাবে আপনাকে চিনিয়াছেন। (সংসারী ব্যক্তিগণ মায়া-মমতায় নিমগ্ন হইয়া থাকে, ইন্দ্রনাথ বৈরাগী হইয়াও সংসারী।) তাঁহার এই বৈরাগ্য-বিভূষিত

মনের ভিতরে সংসারের সাধারণ মানুষের ন্যায় মায়া-মমতা বিরাজমান।

একদিন সকালে নিয়মমত পূজার স্থান করিয়া দিয়া কল্পনা ইন্দ্রনাথের ঘরে গিয়া দেখিল, তিনি এখনো অবধি মেঝেতে রচিত শয্যার উপরে পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছেন।

ইন্দ্রনাথ ও-পাশে মুখ করিয়া নিস্তব্ধভাবে পড়িয়া ছিলেন। সুতরাং দূর হইতে দেখিয়া কল্পনা স্থির করিতে পারিল না—তিনি নিদ্রাভিভূত কি না। দুই, তিন মিনিট্ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে ধীরে ধীরে ইন্দ্রনাথের সন্নিকটে আসিল। হইয়া দেখিল, তিনি দেওয়ালের দিকে স্থির-চক্ষে চাহিয়া আছেন এবং তাঁহার চোখ্ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

তাঁহার এই দুর্ব্বলতার পরিচয়ে কল্পনার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, শিপ্রা ও শরদিন্দুর চিন্তায় ব্যথিত হইয়া তিনি এমনি আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। ইন্দ্রনাথের চক্ষের জল এই প্রথম তাহার দৃষ্টিতে ধরা পড়িল।

কল্পনা ইন্দ্রনাথের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া, ভক্তিভরে পা'দুইটিতে হাত বুলাইতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথের চমক ভাঙ্গিল। গভীর চিন্তা হইতে নিজেকে সজোরে পৃথক করিয়া চক্ষু নামাইয়া পায়ের দিকে চাহিতেই উঠিয়া বসিলেন।

—চান্ ক'রে এসো বাবা; বেলা হ'য়েছে। পূজোর আয়োজন আমি ক'রে রেখেছি।

ইন্দ্রনাথ নিজেকে সংবরণ করিয়া সংক্ষেপে বলিলেন, চলো!

বলিয়া তিনি উঠিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে ইন্দ্রনাথের স্নান শেষ হইলে, বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া পূজায় বসিলেন। পূজা সারিয়া উঠিতে উঠিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় অতিবাহিত হইয়া গেল।

মধ্যাহ্নে আহারাদির পর ইন্দ্রনাথ বিছানায় শয়ন করিয় কল্পনাকে কহিলেন, আজ দু'-চার খানা কীর্ত্তন গাও তো, মা। অনেক দিন তোমার মধুর কণ্ঠের গান শুনিনি।

কল্পনা ঈষৎ হাস্যে বলিল, এতো আমার পরমভাগ্যের কথা, বাবা! এতোদিন তোমাকে গান শোনাবার সুযোগ পাইনি ব'লে নিজের মনে আক্ষেপের সীমা ছিল না। কিন্তু আজ আমার আনন্দের শেষ নেই।

এই বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিবার পর, সে গাহিতে সুরু করিল।

পর-পর চার-খানা কীর্ত্তন গাহিয়া কল্পনা চুপ্ করিল। ইন্দ্রনাথের মুখের নিকে দৃষ্টি পড়িতে দেখিল, তাঁহার দুই চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

ইন্দ্রনাথ বাহিরের দিকে নির্নিমেষে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, আজো যদি শিপ্রা ফিরে আস্তো, কল্পনা! আমি অবিবাহিত। সন্তানের কি আকর্ষণ জান্তুম না। কিন্তু শিপ্রার জন্যে মনে হ'চ্ছে—আমি বৈরাগী হ'য়েও সংসারী। আমার মন সাধারণ মানুষের মতো!

এই বলিয়া তিনি ক্ষীণ হাসি হাসিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। ইন্দ্রনাথের উক্তির শেষভাগে গলাটা কেমন ধরিয়া আসিয়া ছিল। উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন-বেগ দমন করিতে যাইয়া তিনি ওষ্ঠপ্রান্তে যে-ক্ষীণ হাস্যরেখা টানিয়া আনিলেন, তাহা নিরীক্ষণ করিয়া কল্পনা সত্য-সত্যই মর্ম্মাহত হইল। মানুষ হাসে বহুপ্রকার রূপ লইয়া। এবং সেই হাস্যে প্রাণ থাকে, যখন আনন্দ আসিয়া তার সহিত যোগ দেয়। কিন্তু বিষাদের ছায়া যখন হাসির সহিত প্রগাঢ় বন্ধুত্ব পাতাইয়া বসে, তখন মানুষের চেহারায় সাময়িক যে-রূপ আত্মপ্রকাশ করে, তাহা যেমন করুণ তেমনি বিয়োগান্তক!

কল্পনা আজি নিজের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিল, কতো মানুষ ভালোবাসার মন্দিরে কতো বড়ো ভিখারী-ই না রহিয়া যায়! এবং এখানে যাহারা দিবারাত্রি অঞ্চল বিছাইয়া বসিয়াছে, তাহারা হয়তো ইহার এককণাও দান পায় না! আবার এমনও দেখা যায়—ভালোবাসার মন্দির-পুরী ত কোথায় কোন্ ফাঁকে নিতান্তই অতর্কিতে, অজ্ঞাতসারে নর-নারীকে আকর্ষণ করিয়া ভিতরের শ্রেষ্ঠাসনে বসাইয়া দেয়। মানুষ বুঝিতে পারে না, কোথায় ইহার বীজ। কি প্রকারে যে মহীরুহে পরিণত হইয়া মর্ত্ত্যের অধিবাসিগণকে উন্মত্ত করিয়া তুলে, ইহাও বোধকরি সহজে আলোকে আসিয়া পড়িতে চাহে না!

কল্পনা বহুক্ষণ কোনো কথা না বলিয়া, অধোমুখে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। এবং ইন্দ্রনাথের বক্ষ ভেদ করিয়া যখন একটা চাপা নিঃশ্বাস বাহিরের বাতাসের সহিত মিশিয়া গেল, তখন সে

তাঁহার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, অতো কাতর হ'চ্ছো কেন, বাবা? আমিও তো তোমার আর এক মেয়ে। আমাকে কি তুমি ভালোবাসনা?

শুনিয়া ইন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে কল্পনার মাথাটায় সযতনে হাত বুলাইয়া বলিলেন, বাসি বৈকি মা, ভালো আমি তোমায়ও বাসি কিন্তু শিপ্রার জন্যে যে-স্থান এই বুকখানার ভেতর লুকিয়ে আছে তার তো কোনো সীমা নেই, মা!

কল্পনা অভিমান-ভরে কহিল, কেন, আমি কি কোনো অ তোমাকে স্পর্শ ক'র্‌তে দি'? সে যেমন সব দিক দেখ্‌তো, আমিও তো তেমনি দেখি, বাবা!

ইন্দ্রনাথ এই অভিমানপূর্ণ উক্তির জবাবে বলিতে লাগিলেন, আশ্রমের কাজ-কর্ম্মর ভার তুমি নিজের 'পর নিয়ে আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েছো! আমার প্রতি তোমার সেবা-শুশ্রূষা, আদর-যত্ন, ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রশংসনীয়। একদিক দিয়ে তুমি শিপ্রার চেয়েও বড়ো। কিন্তু মানুষের স্নেহ-ভালোবাসা যে সব সময়ে এ-গুলোকে ওজন ক'রে দেখেনা—এই তো হ'য়েছে সব চেয়ে বড়ো দুঃখ, কল্পনা!

কল্পনা এ-কথার প্রতিবাদ করিলনা। মিনিট্ খানেক মৌন থাকিয়া কহিল, আর একটা কীর্ত্তন গাইবো, বাবা?

—আজ থাক্, মা। তোমার গানের সঙ্গে যে-করুণ সুর আমার কানে ভেসে এসেছে, সে যে আমি প্রাণের সঙ্গে উপভোগ ক'রে, অন্তরের বেদনা বাড়িয়ে তুলেছি। তোমার গলা কী মধুর মা!

এই বলিয়া ইন্দ্রনাথ মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, এমনি করুণ লালিত্যপূর্ণ স্বরে শরদিন্দুর বাঁশী এই বুকেই বেজে উঠ্‌তো। কতোদিন রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে ওয়াতে কান পেতে নিঃসাড়ে শুয়ে ওর বাঁশী শুনেছি! কী স্পষ্ট তার ভাষা! যেনো বাঁশীর প্রাণ নিয়ে মুখেই স্বর ক'রে ন গেয়েছে!

ইন্দ্রনাথ চুপ্ করিলেন। কল্পনা কি বলিবার জন্য নিজেকে ঠি করিয়া লইতে ছিল, এমনি সময়ে আশ্রমের একটি মেয়ে আসিয়া ইন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, একটা লোক বন্দুক কাঁধে ক'রে আপনাকে খুঁজ্‌ছে। ও ব'ল্‌ছে—ছোটোবাবু ওকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।

থ উঠিয়া বসিলেন। মেয়েটির মুখ খানায় আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, আমাকে খুঁজ্‌ছে বন্দুক কাঁধে করা একটা লোক? ছোটোবাবু পাঠিয়ে দিয়েছে। ঠিক্ চিন্‌তে পার্‌লুম না তো? আচ্ছা চলো, দেখে আসি।

বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এবং ঘরের বাহিরে আসিয়া খানিকটা পথ পিছনে রাখিয়া অগ্রসর হইতেই শিখ্ দ্বারবান তাঁহাকে দীর্ঘ সেলাম দিল। লোকটা আসল ব্যক্তিকে চিনিয়াছে।

বলিল, মায়জী এহপর আয়েগা। এহসেন্ বাৎ বাবু আপ্‌কো ব'ল্‌নে ব'লা। আপ্‌হি তো ইন্দ্রনাথ সাধুজী হ্যায়?

ইন্দ্রনাথ নীরবে ঘাড় নাড়িলেন, কথা কহিলেন না। লোকটা কি করিয়া আশ্রমের অনুসন্ধান পাইল, কে তাহাকে এখানে

পাঠাইয়াছে, সেসব কথা নূতন করিয়া জানিতে তাঁহার তখন প্রয়োজন বলিয়া মনে হইল না। অনুমানে তিনি বুঝিয়া লইলেন—মায়জী অর্থে শিপ্রা, এবং শরদিন্দু, ছোটোবাবু! কিন্তু দ্বারবান যখন তাঁহার চক্ষের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল, তখন তাঁহার মনে হইল—একবার ভালোভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া সন্দেহটা দূর করিলেই হইত। শরদিন্দুর নিকট হইতেই যে এ লোকটা আসিয়াছে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? তবে কে তাহাকে পাঠাইল?

চিন্তিতমনে ইন্দ্রনাথ আশ্রমের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াই এবং তড়িৎপদ-বিক্ষেপে খানিকটা পথ অগ্রসর হইয়া গেলেন-দ্বারবানের দর্শন পাইবার জন্য। কিন্তু তাহার সাক্ষাৎ মিলিল না।

আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া, ইন্দ্রনাথ পূর্ব্ব-স্থানে মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিলেন।

এমনি কতক্ষণ কাটিয়া গেল। এক সময়ে কল্পনা ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, দ্বারবান শরদিন্দুবাবুর কাছ থেকেই এসেছে। কিন্তু ওঁর পয়সার গর্ব্ব দেখেছেন, বাবা! বাড়ীর দ্বারবানকে বন্দুক দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হ'য়েছে—শিপ্রার ফিরে আস্‌বার সম্বাদ নিয়ে। উনি নিজে আস্‌তে পার্‌লেন না! উনি পয়সার এবং বন্দুকের ভয় দেখিয়ে নিজের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে চান্!

কল্পনার এবম্বিধ মন্তব্য ইন্দ্রনাথের ভালো লাগিল না। তিনি মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিলেন। কিন্তু বেশ শান্তস্বরে

কহিলেন, শরদিন্দু লোক পাঠিয়েছে, তুমি কি ক'রে জান্‌লে, কল্পনা ?

-আমি জানি, বাবা। আমার মনই এখানে সব চেয়ে বড়ো প্রমাণ।

-আমিও তাই ভাব ছি কল্পনা, এ শরোর লোক ছাড়া যায় না। কিন্তু এতোদিন পরে শিপ্রাকে এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছে কেন ?

কল্পনা ইন্দ্রনাথের পদদ্বয়কে সম্মুখ করিয়া বসিয়া পড়িল। কহিল, ওদের দু'জনের মধ্যে হয়তো কোনো জায়গায় অমিল হ'য়েছে। কিন্তু একটা কথা জিগ্যেস্ ক'রি বাবা, শিপ্রা এতো দিন পরে শরদিন্দুবাবুর কাছ থেকে ফিরে আস্‌ছে। উনি যদি ওকে বিয়ে না ক'রে থাকেন, তবে এখানে শিপ্রাকে স্থান দেওয়ায় কি আপনার ধর্ম্মনিষ্ঠা মনে একটা জ্ঞাত পাপের ছাপ্ প'ড়্‌বে না ?

শুনিয়া ইন্দ্রনাথ অত্যধিক বিস্মিত হইলেন। বেশী কথা কহিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। গম্ভীর মুখে কহিলেন, আমার অমরাবতী-আশ্রম কোনো দিন কারুর পাপের গুরুত্ব বিচার করে না। তোমাকে এখানে স্থান দিয়েছি। এর মূলে যদি তোমার গত দিনের দুষ্কৃতির বিচার আশ্রয় পেতো, তবে তুমিও এখানে স্থান পেতে না। শিপ্রা আমার কতো বড়ো, তা' তুমি জানো না। ওকে চিন্‌তে এখনো তোমার অনেক বাকী !

কল্পনার মুখ আপনা হইতেই আনত হইয়া আসিল। ইন্দ্রনাথ যে, প্রকারান্তরে তাহাকে দুই কথা শুনাইয়া দিলেন, ইহা অবধারিত হইতে তাহার কালবিলম্ব হইল না। ইহার পর আর কোনো কথা হইল না। কল্পনা আরো কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া, কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

— তেরো —

শিপ্রা চলিয়া যাইবার পর, দিন পাঁচ-সাত শরদিন্দু মানসিক ভালো না থাকিলেও দৈহিক অসুস্থ ছিল না। কিন্তু এক দিন রাত্রে জ্বর গায়ে, রক্তবর্ণ চক্ষুতে বাড়ী ফিরিয়া সে শয্যা গ্রহণ করিল।

প্রায় পাঁচ-ছয় বছর পর এই প্রথম তাহার শারীরিক অসুস্থতা। শরদিন্দু মনে মনে বুঝিল, যখন সে শয্যা গ্রহণ করিয়াছে তখন পীড়া তাহাকে সহজে নিষ্কৃতি দিবে না।

রোগ-শয্যায় একদিন বহুকালের বিশ্বস্ত সরকারমহাশয় তাহার মাথায় জলপটি লাগাইতে লাগাইতে ইতস্ততঃ করিয়া যখন শিপ্রাকে আনিবার কথা পাড়িল, তখন শরদিন্দু সহসা ক্ষেপিয়া উঠিল। জ্বরের উত্তাপে এবং শরীরের দৌর্ব্বল্যে ভালো করিয়া কথা কহিবার শক্তি তাহার নাই, কিন্তু তবু যথাসাধ্য স্বর উচ্চে তুলিয়া বলিল, তুমি যাও আমার সুমুখ থেকে। সবতাতেই তোমার মাতব্বরি।

সরকারমহাশয় দুঃখিত হইল না। মনিবের প্রতি তাহার যেমন ভক্তি তেমনি শ্রদ্ধা। সে ধীরে ধীরে কহিল, ছোটোবাবু, আপনাকে দেখ্‌বার তো একজন লোক চাই। অসুখে মেয়ে-ছেলের সেবা-যত্ন সবচেয়ে দরকারী। আমরা ব্যাটা-ছেলে। হাজার হোক ওঁদের মতন পার্‌বো কেন?

-না পারো, চাক্‌রী ছেড়ে দিয়ে চ'লে যাও। আমি মর্‌বো। কারুর সেবা আমি চাইনে। তুমি এখান থেকে যাও, গেলে?

শরদিন্দুর শিয়র হইতে নড়িবার সরকারমহাশয়ের কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। মিনিট্ খানেক মৌন থাকিয়া সে পুনরপি কহিল, ডাক্তারকে খবর দি' ছোটোবাবু। এই সময়ের মধ্যে এক ফোঁটা ওষুধও আপনার পেটে প'ড়্‌লো না। কিন্তু নিজেকে এতো কঠোর ক'র্‌বেন না বাবু; আমার এই বুড়ো হাড়ের ভেতর বড়ো যন্ত্রণা হয়!

তাহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া আসিয়াছে।

শরদিন্দুর অন্তরের গভীরতম স্থান হইতে এবার ক্রন্দনোচ্ছ্বাস বাহিরে প্রকাশ হইতে চাহিল। সে পাশ-পাশ ফিরিয়া প্রাণপণ শক্তিতে দাঁত দিয়া ওষ্ঠ চাপিয়া ধরিল।

—ছোড়্‌-দা?

—কি ভাই?

—একবার জরটা দেখ্‌তে হবে যে!

—জ্বর দেখ্‌বে? কিন্তু যন্ত্র দিয়ে জ্বর দেখ্‌বার দরকার কি, ভাই? আমি নিজের হাত দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌ছি—জ্বর অনেক!

সরকারমহাশয় আন্তরিক ব্যাকুলতায় যারপর নাই চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে শরদিন্দুর গায়ে লেপখানা ভালো করিয়া চাপা দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং যাইতে যাইতে কহিল, আপনি আমাকে মেরে ফেল্‌লেও আজ ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আস্‌বো। আপনার কোনো কথাই শুন্‌তে চাইনে, বাবু।

রাজার ঐশ্বর্য্য আপনার, বিনা চিকিৎসায় প'ড়ে থাক্‌বেন ? আমি থাক্‌তে সে হবে না, বাবু। এই আমি চ'ল্লুম—ডাক্তারের কাছে।

বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল, ডাক্তার ডাকিতে।

যথাসময়ে ডাক্তার আসিয়া, রোগী দেখিয়া, ঔষধ লিখিয়া দিলেন। এবং বাড়ীতে স্ত্রীলোকের অভাব জানিয়া একটি নার্শ নিযুক্ত করিবার উপদেশ দিয়া গেলেন।

সপ্তাহকাল পরে একদিন শরদিন্দু পার্শ্বোপবিষ্ট সরকার মহাশয়ের একখানা হাত টানিয়া লইয়া কহিল, আমার একটা কথা রাখ্‌বে ?

সরকারমহাশয় তাহার দুই চক্ষে সম্পূর্ণ সম্মতির ভাব প্রকাশ করিয়া, শরদিন্দুর মুখ-প্রতি চাহিয়া রহিল।

শরদিন্দু তাহার হাতখানা তেমনি ভাবে ধরিয়া রাখিয়া বলিল নার্শের সেবায় আমার অসুখ সার্‌বে না, দাদা! ওদের সেবা যে পয়সার খাতিরে, ভাই! প্রাণের সঙ্গে শুশ্রূষা ক'র্‌তে যে ওরা জানে না! বলিয়া একটু চুপ্ করিয়া পুনশ্চ কহিল, একবার শিপ্রাকে খবর দিতে পারো, দাদা ? আমি জানি—আমার অসুখ শুন্‌লে, সে কিছুতেই না এসে থাক্‌তে পার্‌বে না!

—আজ-ই দোবো, ছোড়্‌দা'। আপনি সুস্থির হ'য়ে একটু ঘুমবার চেষ্টা ক'রুন দেখি।

নিদ্রা ? নিদ্রা কি শরদিন্দুর চোখে আছে ? পীড়ার প্রভাবে একে সে অস্থির, তাহার উপর শিপ্রার চিন্তা! সে চুপ্ করিয়া

পড়িয়া রহিল। সরকারমহাশয় সেল্‌ফ হইতে কিছুক্ষণ পরে ঔষধের শিশি এবং কাঁচের ছোটো গ্লাস হাতে লইয়া এক দাগ ঔষধ ঢালিল। গ্লাসটা মনিবের মুখের কাছে ধরিয়া কহিল, ওষুধটা খেয়ে নিন্ ছোড়্‌দা'।

বাঙ্গালী নার্শ পাশের ঘরে গিয়া ছিল। ঔষধ দিবার সময় হইলে, সে আসিয়া সরকারকে ঔষধ দিতে দেখিয়া কুপিত হইয়া উঠিল। তাহার মুখ-পানে অসন্তোষ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, ওকি, তুমি ওষুধ দিচ্ছো যে? চাকর-বাকর যে রুগীকে ওষুধ দেবে, সে আমি পছন্দ ক'রিনে। তুমি এ-ঘর থেকে যাও। রুগীর মনের শান্তি নষ্ট ক'রো না।

ঔষধ খাইয়া শরদিন্দু সরকারমহাশয়কে কহিল, গোপালদা', ওকে এখুনি চ'লে যেতে বলো। যে-ক'দিন এখানে কাজ ক'রেছে, হিসেব ক'রে মাইনে দিয়ে দাও।

বলিয়া সে মাথার বালিশের তলা হইতে আল্‌মারীর চাবিটা কষ্টে গোপালের হাতে তুলিয়া দিল।

গোপাল স-সঙ্কোচে বলিল, এবারটির মতন ওকে মাপ ক'রুন বাবু। ওঁর দোষ নেই। বাস্তবিক বাবু, বাইরের লোক কি ক'রে জান্‌বে, আপনি আমায় কতো ভালোবাসেন!

এ-কথায় নার্শ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে চাহিল, কহিল, মাপ আমি কারুর কাছ থেকে চাইনে। আমরা পরিশ্রম বেচে টাকা উপায় ক'রি। কারুর দয়া আমরা চাইনে। আমার মাইনে চুকিয়ে দাও। আমি এখুনি চ'লে যাচ্ছি!

শেষের কথাগুলি সে বেশ জোর দিয়াই বলিল।

শরদিন্দু নিরতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু নার্সকে কোনো কথা না বলিয়া গোপালকে ধমক দিয়া কহিল, এখনো তুমি দাঁড়িয়ে আছো? দিয়ে দাও ওর মাইনের টাকা ফেলে, যা!

ইহার উপর সরকারমহাশয়ের কথা বলিবার সাহস হইল না। সে আল্‌মারীটার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

বিকালের দিকটায় সে-দিন শরদিন্দুর জ্বর আরো বাড়িয়া গেল। দেখিয়া শুনিয়া গোপালের মনে ভীতির এবং চিন্তার অবধি রহিল না। বাড়ীতে মেয়ে-ছেলে নাই যে সেবা শুশ্রূষা করিবে। ডাক্তারকে সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু একাকী রোগীকে রাখিয়া যাওয়া যায় না। বাড়ীতে আরো চাকর, দ্বারবান, ঝি রহিয়াছে, কিন্তু ইহাদের উপর তাহার বিশ্বাস নাই। নার্সটা থাকিলেও তো দু'-দণ্ড আগুলিয়া বসিয়া থাকিতে পারিত। একা গোপাল কোন্ দিকে যাইবে, সহসা ভাবিয়া পাইল না।

অমরাবতী-আশ্রমে গাড়ী পাঠানো হইয়াছে—শিপ্রাকে লইয়া আসিবার জন্য। কিন্তু যদি সে না আসে, তবে যে অস্বস্তির এবং চিন্তার সীমা থাকিবে না। গোপাল বহুক্ষণ নিজের মনের সহিত তর্ক-বিতর্ক করিয়া পরিশেষে এই স্থির করিল যে, তাহার ছোটোবাবুর পীড়ার সম্বাদ শুনিয়া শিপ্রা না আসিয়া পারিবে না। সে তো জানে, শিপ্রা তাহার ছোটোবাবুকে কতোখানি ভালোবাসে!

রাত্রি আট্‌টার সময় শরদিন্দুর গাড়ী আসিয়া দরজায়

দাঁড়াইল। সোফার ডান-হাত দিয়া দরজাটা খুলিয়া দিতে, গাড়ী হইতে অবতরণ করিল, কল্পনা।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ভাগ। শীত পড়িয়াছে। কল্পনার গায়ে একখানা লুইয়ের র‍্যাপার। মাথায় অবগুণ্ঠন নাই। শুধু কালো চুলের খোঁপার উপর শাড়ীর প্রান্তভাগ সেফ্‌টিপিন্‌ দিয়া আটকানো।

গাড়ীর শব্দে গোপাল তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল। কিন্তু কল্পনাকে সম্মুখে দেখিয়া যারপর নাই ক্ষুণ্ণ হইয়া উঠিল। সে যে সম্পূর্ণ আশা করিয়াছিল—শিপ্রাকে। কিন্তু এ কে? ইহাকে তো সে পূর্ব্বে দেখে নাই!

কল্পনা তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া বুঝিয়া ফেলিল, এ-বাড়ীতে এমনি সময়ে লোকটি তাহাকে আশা করে নাই।

গোপাল বলিল, আপনাকে কে পাঠিয়ে দিয়েছেন? ইন্দ্রনাথ স্বামীজী কি?

কল্পনা এই প্রশ্নে মনে মনে সবিশেষ অপমান বোধ করিল। গোপালকে দেখিয়া সে বাড়ীর সরকার ভাবিয়াছে। মুখ গম্ভীর করিয়া উত্তর দিল, সে-কথা তোমাকে ব'লে লাভ নেই। এখন আমায় ওপরে নিয়ে যাবে, না এখান থেকেই বিদায় ক'রবে?

গোপাল বিনীতভাবে কহিল, আজ্ঞে না। সেকি কথা? মুখ্যু মানুষ। এ-বাড়ীর চাকর আমি। আমার বিবেচনাশক্তি নেই, মা। আপনি আসুন্‌ আমার সঙ্গে।

শুনিয়া কল্পনার মুখে হাসি দেখা দিল। লোকটি সরল, ইহা সে বুঝিয়াছে। সে নীরবে গোপালকে অনুসরণ করিল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া কল্পনা সর্ব্বাগ্রে স্নান সারিয়া আসিল। গতরাত্রে সে আসিবার পূর্ব্বেই শরদিন্দু নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়া ছিল। ডাক্তার আসিয়া কি একটা ইন্‌জেক্‌শন্ করিয়া যাইবার কিছুকাল পরে সেই যে নিদ্রা আসিয়া তাহাকে ধরিয়াছে, এখনো ছাড়িয়া যায় নাই।

কল্পনা পূর্ব্বরাত্রে চুপে চুপে শরদিন্দুর ঘরে আসিয়া তাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া, নিঃশব্দেই ফিরিয়া গিয়া ছিল। সুতরাং শরদিন্দু জানেনা—কল্পনা এখানে আসিয়াছে।

রোগীর ঘর যেমন ভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা আবশ্যক তেমনটি ছিল না। ঘরের মাঝামাঝি স্থানে একটা গোল টেবিল। ইহার উপর ঔষধ, গ্লাস, ফল ইত্যাদি বস্তু সকল অবিন্যস্ত অবস্থায় পড়িয়া। কল্পনা টেবিলটা ভৃত্যের সাহায্যে এক কোণে সরাইয়া উপরের দ্রব্যগুলি গুছাইয়া রাখিল। শরদিন্দুর মাথার দিকে দেওয়ালের উপর ক্লক্‌টা দমের অভাবে বন্ধ হইয়া গিয়া ছিল; কল্পনা চৌকীর উপর উঠিয়া সেটা দম দিয়া চালাইয়া ছোটো টাইম্-পিস্‌টার সহিত কাঁটা মিলাইয়া দিল। ওদিক্‌কার কোণে অর্দ্ধমলিন জামা-কাপড় পড়িয়া ছিল; কল্পনা সেগুলি ভৃত্যকে দিয়া ছাদের একপার্শে রাখাইল। দেওয়ালের গায়ে একটা ইংরাজী ক্যালেণ্ডার ঝুলিতে ছিল; দিন কয়েকের প্রাত্যহিক তারিখ

রিবর্ত্তন করা হয় নাই। কল্পনা যথাযথ তারিখ পাল্টাইয়া যাজিকার তারিখ বাহির করিয়া রাখিল।

ঘুম ভাঙ্গিতেই শরদিন্দুর চোখ্ পড়িল কল্পনার মুখের উপর। কি; কল্পনা? এখানে কেন সে? শিপ্রা তবে কি আসে নাই? তাহার পীড়ার সম্বাদও সে তুচ্ছ বলিয়া মনে করিয়াছে?

—নমস্কার, শরদিন্দুবাবু, কেমন আছেন আজ?

শরদিন্দু একখানা হাত মুঠি করিয়া কপালে ঠেকাইয়া প্রতি-নমস্কার করিল। কিন্তু কল্পনার প্রশ্নের জবাব দিল না। সে প্রতি-প্রশ্ন করিল, আপনি এখানে কেন? শিপ্রা এলোনা?

তাহার এই প্রশ্নে কল্পনা ঈষৎ ব্যথিত হইল। মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল, না, সে আসে নি। কিন্তু, আমার আসাটা কি আপনাকে খুব বেশী ক্ষুণ্ণ ক'রেছে, শরদিন্দুবাবু?

শরদিন্দু দুই চক্ষু বুজিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে শুইয়া রহিল। গতরাত্রে ইন্‌জেক্‌শন্ করার ফলে তাহার শরীরটা আজ প্রভাতে একটু ভালো বলিয়াই মনে হইতে ছিল। তবে মাথার যন্ত্রণাটা এখনো রহিয়াছে।

কপালটা বাঁ-হাত দিয়া আস্তে আস্তে টিপিতে টিপিতে শরদিন্দু চোখ্ চাহিল। এবং একটু পরে দৃষ্টি গায়ের লেপ্‌টার উপর ন্যস্ত করিয়া কল্পনার প্রশ্নোত্তরে কহিল, আপনার এখানে আসাতে আমি ক্ষুণ্ণ না হ'লেও সুখী হ'তে পারিনি। কেননা, আপনাকে এড়াবার জন্যেই আমি পালিয়ে এসে ছিলুম।

শরদিন্দুর মুখ হইতে যে, এমনি একটা অপ্রীতিকর, শ্রুতিকটু উত্তর এই সময়ে বাহির হইয়া আসিবে, ইহা কল্পনা একটু পূর্ব্বেও ভাবে নাই। ক্ষণকালের তরে সে নির্ব্বাক্যে দুই চক্ষু প্রসারিত করিয়া তাহার মুখ-পানে চাহিয়া রহিল এবং এক সময়ে ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া মিনিট্ দশেক পরে এক ঘটি গরম জল এবং দাঁতের মাজন হাতে করিয়া পুনর্ব্বার ঘরে ঢুকিল।

ঘটি এবং মাজন একখানা টুলের উপর রাখিয়া শরদিন্দুকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, মুখ ধুয়ে নিন্। বাশি কাপড়টাও ব'দ্‌লে ফেলুন্।

শরদিন্দু কথা কহিল না। যেমন শুইয়া ছিল, তেমনি শুইয়া রহিল।

কল্পনা একটু পরে পুনরায় বলিল, আমি নীচে থেকে একবার আস্‌ছি। সরকারমশাইকে এখানে পাঠিয়ে দোবো?

শরদিন্দু এবার কথা কহিল। বলিল, না থাক্। তাঁকে এখন ডাক্‌বার দরকার নাই। কিন্তু আপনি নীচে যাবেন কেন আমার কাছে দু'দণ্ড ব'স্‌লে বুঝি আপনার সময়ের অপব্যবহার হয়?

কল্পনা স্মিতহাস্যে কহিল, তা' জানিনে। আমাকে এড়াবার জন্যে আপনি আশ্রম থেকে চ'লে এসে ছিলেন, এ-কথা এই মাত্র আপনি ব'ল্‌লেন। এখন আবার ও-কথা কেন, শরদিন্দুবাবু?

শরদিন্দু ব্যাকুল হইয়া বলিল, আমার মাথার ঠিক্ নেই। শিপ্রা আস্‌বেই, এই আমি আশা ক'রে ছিলুম। কিন্তু তার বদলে যখন হঠাৎ আপনাকে দেখ্‌লুম এখানে, তখন আমার মনে

হ'লো, আপনিই জোর্ ক'রে ওকে আস্তে দেন্নি। এতো কাল যে-সুযোগের প্রতীক্ষায় ব'সে ছিলেন, সেটা আপনিই আসাতে নিজেকে প্রকাশ ক'র্তে চেয়েছেন।

কল্পনা শুনিয়া মুখ নীচু করিয়া রহিল এবং ক্ষণকাল পরে শরদিন্দুর কপালটা ডান-হাত দিয়া ধীরে ধীরে টিপিতে লাগিল।

শরদিন্দু আপত্তি করিল না। বলিল, কাল রাত্রে এসেছেন, না?

—হ্যাঁ।

—শোবার কোনো অসুবিধে হয় নি তো?

কল্পনার ইচ্ছা হইল বলে, যতো অসুবিধেই হ'ক্ না, আপনার সেবা ক'র্তে পার্ছি এই আমার যথেষ্ট। কিন্তু প্রকাশ্যে কহিল, না।

শরদিন্দু নিঃশব্দে শুইয়া কল্পনার কোমল হস্তের সেবায় মনে মনে তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিল। এবং কয়েক মিনিট নীরবে অতিবাহিত হইয়া গেলে সে অকস্মাৎ কল্পনার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, আপনি এতো চমৎকার মাথা টিপ্তে পারেন! মাথার কি অসহ্য যন্ত্রণা আমার হ'চ্ছিল। এখন অনেকটা কমে গেছে।

এই প্রশংসা-বাক্যে কল্পনা তিলমাত্রও উৎসাহিত হইল না। নিজের হাত মুক্ত করিয়াও লইল না। শরদিন্দুর হাতের মধ্যে হাত রাখিয়া, চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিল।

এমনি ভাবে কিছুক্ষণ গত হইলে এক সময়ে শরদিন্দু কল্পনার হাতখানা ছাড়িয়া দিল, বলিল, আচ্ছা, শিপ্রা কেন এলো না

ব'লুন্ তো? ও নিজের ইচ্ছায় এলোনা, না, আপনি ওকে আস্‌তে দিলেন না? ওর 'পর আপনার ঈর্ষা আছে, না?

কল্পনা নতমুখে পরণের কাপড়টার পাড়ের সুতা অনর্থক ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে কহিল, সে-কথা আজ আপনার জেনে কোনো লাভ হবেনা, শরদিন্দুবাবু। যদি সময় আসে, নিজেই একদিন এর কারণ জান্‌তে পার্‌বেন—কারুর সাহায্য দরকার হবে না।

এই বলিয়া সে চুপ্ করিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তকালের জন্য। মুখ তুলিয়া শরদিন্দুর চোখের দিকে চাহিল, কহিল, আর ঈর্ষার কথা? শিপ্রাকে ঈর্ষা আমি ক'রিনে। করি, তার ভাগ্যকে। কিন্তু সে-কথা যাক্। আপনি মুখ ধুয়ে নিন্। গরম জল ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো।

সে সরিয়া আসিয়া ঘটির জল স্পর্শ করিল—জল সত্যই ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে।

কল্পনা ঘটিটা হাতে তুলিয়া লইল, বলিল, গরম ক'রে নিয়ে আসি। জল ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। আপনি আস্তে-আস্তে বিছানার ওপর উঠে ব'সুন্।

সে বাহির হইয়া গেল।

ইলেক্‌ট্রিক ষ্টোভে পুনরায় জল গরম করিয়া কল্পনা ঘরে আসিল। শরদিন্দু তখনো শয্যায় শুইয়া কি চিন্তা করিতে ছিল। কল্পনা খাটের তলা হইতে পিক্‌দানীটা টানিয়া বাহির করিল, বলিল, ওকি আপনি এখনো শুয়ে আছেন যে? নিন্, আমাকে ধ'রে একটু উঠে ব'সুন্।

শরদিন্দু কহিল, আমি নিজেই উঠে ব'স্‌ছি। আপনাকে ধ'র্‌তে হবে না। বলিতে বলিতে সে উঠিয়া বসিল।

শরদিন্দুর দাঁত মাজা এবং মুখ ধোয়া শেষ হইলে কল্পনা ভৃত্যকে ডাকিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে বলিয়া, ঘরের বাহিরে আসিল। এবং অল্পক্ষণ পরে একবাটি গরম দুধ হাতে লইয়া ফিরিল। শরদিন্দু তখন পিছনে গোটা-দুই বালিশ ঠেস্ দিয়া অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসিয়া ছিল। কল্পনার হাতের দিকে চাহিয়া কহিল, আপনার সেবার জোরে দেখ্‌ছি আমার বেশীদিন রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করা হ'য়ে উঠ্‌লো না। এ-রকম সেবা, যমেও ভয় পায়।

কল্পনা ঈষৎ হাসিল। হাতের পাশের টুল্‌টার উপর দুধের বাটিটা রাখিয়া বলিল, ছাই সেবা। আমাদের কাছ থেকে আপনারা যতোটা সেবা-শুশ্রূষা আশা করেন, তার কতোটুকুই বা আমি পারি? এখন ও-সব কথা রাখুন্। দুধটুকু খান্। শুন্‌লুম, কাল রাত্রে আপনার পেটে ওষুধ ছাড়া কিছু পড়ে নি।

শরদিন্দু পলকহীন-চক্ষে কল্পনার মুখখানার দিকে চাহিয়া কহিল, আপনি এতো খবর এর মধ্যে সংগ্রহ ক'রেছেন? এখানকার সব-ই বোধ আপনার, এই ক'ঘণ্টার সময়ে, পরিচিত হ'য়ে উঠেছে!

কল্পনা ইহার উত্তরে কিছু বলিল না। দুধের বাটিটা শরদিন্দুর মুখের কাছে ধরিয়া কহিল, খেয়ে ফেলুন্।

—কিন্তু আমি যে দুধ খাইনে।

—খান্‌না,—না, আমার হাতের ছোঁয়া খেতে আপনার ঘৃণা বোধহয় শরদিন্দুবাবু?

এই উক্তির মধ্যে কোনো প্রকার চাঞ্চল্যের রেশ ছিল না। শরদিন্দু নিরতিশয় অপ্রতিভ হইয়া উঠিল। যুক্তহস্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল, মাপ ক'রুন। কথাটা আমি সেভাবে ব'লিনি। ঘৃণা আমি কারুক্‌কেই ক'রিনে—আর আপনাকে ক'র্‌বো? কিন্তু সত্যি, আমি দুধ খাইনে।

বলিয়া কি মনে করিয়া শরদিন্দু কহিল, দুধ খেলে আপনি খুব খুশী হন্, না?

কল্পনা কথা কহিল না। শুধু বাটিটা সেইভাবে ধরিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। শরদিন্দু তাহাকে মৌন থাকিতে দেখিয়া তাহার অন্তরের সুখটা আরো সুস্পষ্ট রূপে অবলোকন করিল, কহিল, আচ্ছা দিন্।

এই বলিয়া সে এক নিশ্বাসে দুধটুকু পান করিয়া শূন্য পাত্রটা ফিরাইয়া দিল।

কল্পনার মুখাকৃতি ঔৎফুল্লে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

— পনেরো

শরদিন্দু উপযুক্ত পরিচর্য্যায় এবং সুচিকিৎসায় নিরাময় হইয়া উঠিল। আজ সে পথ্য করিবে। কল্পনার আনন্দের সীমা নাই। শরদিন্দু অনেক করিয়া তাহাকে মাগুর মাছের ঝোল্ রাঁধিতে বলিয়াছে। রাঁধিয়া পরকে খাওয়াইতে তাহার স্ফূর্ত্তির ও আনন্দের অন্ত থাকে না। শরদিন্দুকে রাঁধিয়া খাওয়াইবে, তাহাতে সে কতো বেশীই না খুশী হইতে পারে!

দশটা বাজিতেই কল্পনা শরদিন্দুর ভাত এবং একবাটি মাছের ঝোল্ লইয়া দোতলায় উঠিয়া আসিল। ভৃত্য ইতিপূর্ব্বেই কল্পনার নির্দ্দেশ মতো ঘরের মেঝেতে আসন পাতিয়া এবং এক গ্লাস জল দিয়া ঠাঁই করিয়া, রাখিয়া ছিল।

ঘরে ঢুকিয়া কল্পনা ভাতের থালা নামাইল। শরদিন্দু তখন ইংরাজী সম্বাদ-পত্রের পাতা উল্টাইতে ছিল। থালা রাখিবার শব্দে মুখ ফিরাইয়া কহিল, ঠিক্ সময়েই ভাত এনে হাজির ক'রেছো, কল্পনা। আচ্ছা, তুমি কি ক'রে জান্‌লে, আমার এখন ক্ষিদে পেয়েছে?

কল্পনা থালা হইতে বাটিটা নামাইয়া রাখিয়া তাহার দিকে চাহিল, বলিল, এ আমরা বুঝতে পারি, শরদিন্দুবাবু! আপনি উঠে আসুন্। দেরী হ'লে ভাত, আর ঝোল্ জুড়িয়ে যাবে।

শরদিন্দু দ্বিরুক্তি না করিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া, আসনে বসিল। জলের গ্লাসটা কাৎ করিয়া জল লইয়া হাত ধুইয়া লইল। তাহার পর ভাত স্পর্শ করিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল, ওঃ এতো গরম ভাত! জুড়োতে আধ ঘণ্টারও বেশী সময় লাগবে যে!

কল্পনা নির্ব্বাক্যে শুধু মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

—ওকি, এর মধ্যেই উঠে প'ড়্ছেন যে?

শরদিন্দু হাস্যসহকারে কহিতে লাগিল, অনেক দিন রোগ ভোগ করবার পর, পথ্য খাবার আগে মনে হয়—এতো দিনের ভাত না খাওয়ার পরিমাণটা একদিনেই পুরিয়ে নোবো। চাই কি, ভাতের থালার দিকে চেয়ে মনে হয়—অতোকটি ভাতে হবে কি? কিন্তু খেতে ব'সে সামান্য আহারে পেট ভ'রে ওঠে। আমার পেটে আর জায়গা নেই, কল্পনা!

—ঝোল্‌টা বুঝি ভালো হয় নি?

—চমৎকার হ'য়েছে। এমন মাছের ঝোল্ বহুদিন খাইনি, কল্পনা। বলিয়া শরদিন্দু মুহূর্ত্তকাল মৌন থাকিয়া কহিল, রাঁধ্‌তেন বটে আমার বৌদি! ঠিক্ তোমার মতো! তাঁর রাঁধ্‌বার সখ ছিল ভারী। আমি বেশী খেতে পারতুম না ব'লে, বৌদির দুঃখের শেষ ছিল না। পাড়ার লোককে ডেকেও নিজের হাতের রান্না খাওয়াতেন!

কল্পনা গোপনে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপিয়া বলিল, আপনার বৌদি, আপনাকে খুব ভালোবাসতেন, না?

বৌদির প্রশংসা করিতে শরদিন্দুর কোনো সময়েই ক্লান্তি থাকে না। এখনো মুক্তকণ্ঠে তাঁহার স্নেহ ও ভালোবাসার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে করিতে সে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং কল্পনা তাহার মুখের উপর দৃষ্টি তুলিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইল—দুই চোখ্ তাহার অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মধ্যাহ্নের দিকটায় কল্পনা আহারাদি শেষ করিয়া শরদিন্দুর ঘরে আসিল। শরদিন্দু চোখ্ বুজিয়া বিছানায় পড়িয়া ছিল। কল্পনা তাহার শিয়রে আসিয়া ডাকিল, শরদিন্দুবাবু, ঘুমলেন নাকি?

শরদিন্দু চোখ্ চাহিল, বলিল, না ঘুমুই নি। তোমার খাওয়া হ'য়েছে?

—হ'য়েছে। কিন্তু আপনি যেনো আজ ঘুমবেন না। অসুখের পর পথ্য পেয়ে প্রথম দিন দুপুরে ঘুমতে নেই। ঘুমলে—আবার জ্বর আসে।

—সে আমিও জানি, কল্পনা। কিন্তু জ্বর যদি আবার আসে, তাতে আমি আর ভয় পাইনে। কেননা, তোমার হাতের সেবায় আমি জ্বরেও শান্তি পাবো।

কল্পনা ব্যথিত হইয়া বলিল, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেনো আপনার কোনো অসুখ-বিসুখ না হয়। আপনার অসুখ শুন্‌লেও, আমার ভারী কষ্ট হয়, শরদিন্দুবাবু!

শরদিন্দু তাহার মুখ-পানে চাহিয়া কহিল, কিন্তু, কেন?

কল্পনা মুখ নীচু করিয়া রহিল। কথা বলিল না।

শরদিন্দু কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া খাটের উপর উঠিয়া বসিল। অদূরে উপবিষ্ট কল্পনার মুখের দিকে পুনশ্চ চাহিয়া কহিল, একদিন আশ্রমে যখন তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়, তখন তুমি আমার দর্শন প্রত্যাখ্যান ক'রে কড়া কথা শুনিয়ে ছিলে—মনে পড়ে?

—পড়ে। বলিয়া কল্পনা মুখ তুলিল।

—একদিন গভীর রাত্রে যখন চাঁদের আলোতে ব'সে বাঁশী বাজাচ্ছিলুম, তখন তুমি নিঃসাড়ে আমার পাশে এসে ব'সে ছিলে। সে-কথা ভুলে যাওনি বোধহয়, কল্পনা?

—না।

শুনিয়া শরদিন্দু মিনিট দুই মৌন থাকিয়া পুনরপি কহিল, এ-সবের কি কোনো মানে তোমার জানা নেই, কল্পনা?

—আমরা নারী। সব সময়ে তো, মানে রেখে কাজ ক'রিনে, শরদিন্দুবাবু!

—তা'হ'লে সেদিনকার ব্যাপারে কোনোই তাৎপর্য্য নেই! কিন্তু কল্পনা, আমি যে তোমাকে···

কল্পনা মধ্যপথে বাধা দিল, কহিল, আমাকে ভালোবাসেন, এই তো? মানুষ, মানুষকে ভালোবাসবে, এর চেয়ে আনন্দের আর কি থাকতে পারে? কিন্তু ভালোবাসা অনেক রকমের আছে, শরদিন্দুবাবু! এই বলিয়া গায়ের কাপড় ভালো করিয়া জড়াইয়া নিঃসঙ্কোচে কহিতে লাগল, নর-নারীর যৌবনকালে যে-ভালোবাসা পরস্পরকে কেন্দ্র ক'রে ব'হে যায়, সে-ভালোবাসা আমাদের দু'জনের মধ্যে যেনো তিলমাত্রও স্থান না পায়! চাই

সেই ভালোবাসা, যা' এই বাংলার ভূমিকে আরো মধুর ক'রে তুল্‌বে!

—সে কি, কল্পনা?

—সেও ভালোবাসা শরদিন্দুবাবু, যা' ভাই-বোনের মধ্যে থাকে।

—কল্পনা.....

শরদিন্দুর মুখ হইতে শব্দটা এমনি অস্বাভাবিক সুরে বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কথাটা উচ্চারিত হইল, সেও পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তের তরে বিস্মিত এবং কুণ্ঠিত না হইয়া থাকিতে পারিল না।

কল্পনা ধীরে ধীরে শরদিন্দুর পায়ের কাছে অগ্রসর হইয়া আসিল এবং পরক্ষণেই তাহার পা' দুইটিতে নিজের মাথা স্পর্শ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল, কহিল, আজ আমাকে আশীর্ব্বাদ করো দাদা, যে-উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আশ্রমে এসেছি, তার যেনো কোনো দিকেই অসম্পূর্ণতা না থাকে।

শরদিন্দু দেখিতে পাইল, কল্পনার অনিন্দ্যসুন্দর হরিণীর ন্যায় চক্ষুদ্বয়ের কোণে অশ্রু সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। দুই মিনিট্ সেদিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, বুঝেছি, কল্পনা। তুমি শিপ্রার কাছে নিজেকে বিশ্বস্ত প্রতিপন্ন কর্‌বার জন্যে আজ নিজেই এতে বড়ো স্বার্থ ত্যাগ ক'র্‌ছো! কিন্তু তাতে তুমি কি শান্তি পাবে

কল্পনা শাড়ীর প্রান্তভাগে চক্ষু মুছিয়া কহিল, পাবো বৈকি, দাদা! শান্তি যে আমাকে খুঁজে নিতেই হবে; নইলে, আমার এ-জীবনে দুঃখের ও অস্বস্তির সীমা থাক্‌বে না!

এই বলিয়া সে চুপ্ করিয়া থাকিয়া পুনশ্চ বলিল আমার, একটা ভিক্ষে আছে, রাখ্বে ?

—রাখ্বো !

—তুমি শিপ্রাকে বিয়ে ক'রো, দাদা। সে তোমাকে ভালোবাসে। তুমি আশ্রমে ফিরে যেওনা। আর.....

শরদিন্দু আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, আর কি, কল্পনা ?

—আর তোমার একখানা ফটো আমাকে দিতে হবে, দাদা। বলো দেবে ?

শরদিন্দু কণ্ঠে স্নেহস্বর ঢালিয়া দিয়া কহিল, দোবো ভাই। কিন্তু আমার ফটো নিয়ে তুমি কি ক'র্বে, কল্পনা ?

কল্পনা নিঃসঙ্কোচে তৎক্ষণাৎ বলিল, পূজো ক'র্বো !

—পূজো ক'র্বে ?

—হ্যাঁ পূজো ক'র্বো, দাদা। ভগবানের ইচ্ছামতো মূর্ত্তি গ'ড়ে নিয়ে আমরা পূজো ক'রি। তাতে ভগবানের প্রকৃত রূপ চোখে ধরা পড়েনা। তোমার সাকার মূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি পূজো ক'রে আমি, ইচ্ছামতো গ'ড়ে নেওয়া দেবমূর্ত্তির চেয়ে, অনেক বেশী সুখ-শান্তি এবং তৃপ্তি অনুভব ক'র্বো, দাদা। তুমি যেনো আমার এই সাধটি অপূর্ণ রেখোনা।

শুনিয়া শরদিন্দু যারপর নাই বিস্মিত হইয়া নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। শিপ্রা তাহাকে ভালোবাসে। কিন্তু সেও তো কল্পনার মতো এমনি তাহার একটা ফটো চাহিয়া, লইয়া যাইতে পারিত। একবার যদি সে শরদিন্দুর ফটো শুধু চাহিত, তবে তাহার মনে কি আনন্দের প্রস্রবণ বহিয়া যাইত না ?

শরদিন্দুকে এমনি বহুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে দেখিয়া কল্পনা মনে মনে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাব্‌ছো, দাদা?

শরদিন্দু একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিজের চিন্তাধারা গোপন রাখিয়া বলিল, ভাব্‌ছি দু'দিন বাদে তুমিও শিপ্রার মতো চ'লে যাবে! তখন আমি একা, সম্পূর্ণ একা। আমার এতো বড়ো বাড়ী, এতো বিষয়-সম্পত্তি—এ-সবের কোনো দামই আমার কাছে নেই। জীবনটা সম্পূর্ণ ক'রে তোলবার ভারী ইচ্ছা ছিল, কল্পনা। কিন্তু একটা মুখের কথা সব উল্টে দিয়ে গেলো!

- সে কি, দাদা?

—শুনে তোমার কাজ নেই, কল্পনা। তুমি নারী হ'য়ে সেকথা সহজ ক'র্‌বে কেমন ক'রে?

কল্পনা নিজের প্রশ্নের উত্তর কতোকটা অনুমান করিয়া লইল। কিন্তু সে ইহার সম্বন্ধে আর কোনো কথাই উত্থাপন করিল না। দেওয়ালের ক্লক্‌টার পানে চাহিয়া বলিল, চার্‌টে বাজ্‌লো। এখন কি খাবে?

—কিছুনা। ক্ষিধে হয়নি।

বলিতে বলিতে শরদিন্দু বিছানা হইতে নামিয়া মাটিতে দাঁড়াইল। তাহা দেখিয়া কল্পনা ব্যস্ততাসহকারে বলিয়া উঠিল, কোথায় যাচ্ছো, দাদা?

—জমিদারীর কাগজ-পত্রগুলো একবার ভালো ক'রে দেখ্‌তে হবে। অনেক বাকী খাজ্‌না প'ড়েছে! পান্‌সাওলার প্রজারা

একরকম খাজ্‌না দেওয়া বন্ধ ক'রেছে। আমাকে বোধহয় শীগ্যির ওখানে যেতে হবে!

—কিন্তু মনে রেখো, দাদা—তোমার শরীর এখনো সবল হয়নি। বেশী পরিশ্রম এখন তোমার সহ্য হবে না!

শরদিন্দু মৃদু-হাস্যে কহিল, পরিশ্রম করার ফলে আবার যদি অসুখে প'ড়ি, তবে তুমিই যে আমার সব চেয়ে বড়ো ভরসা, বোন্! আমি জানি, তোমার এই দাদাকে বিপদে ফেলে তুমি কোথাও একপা' ন'ড়্‌তে পার্‌বে না!

কল্পনার দুই চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল। এবং উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতে লাগিল, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, দাদা—যেনো তোমার সেবা করা ক আমি জগতের সবচেয়ে বড়ো ধর্ম্ম ব'লে সব সময়েই মেনে নিতে পারি। এই মেনে নেওয়ায়, যেনো কোনো রকম ফাঁকি প্রশ্রয় না পায়!

শরদিন্দু ভাবিয়া ছিল—কল্পনা এতো শীঘ্র আশ্রমে ফিরিয়া যাইবে না। কিন্তু একদা সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণে সে যখন গায়ে লুইয়ের র‍্যাপারখানা জড়াইয়া এলোচুলে শরদিন্দুর ঘরে আসিয়া সহসা তাহার পায়ে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া সাশ্রুনয়নে বলিল, তবে আসি, দাদা? তখন শরদিন্দু বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, সে কি, কল্পনা? কোথায় যাবে তুমি?

কল্পনা চোখ্ মুছিয়া কহিল, সে তো তুমিও জানো, দাদা? এ-হতভাগিনীর যাবার আর কোন্ স্থান আছে!

শরদিন্দু বুঝিতে পারিল, কল্পনা আজ আশ্রমে ফিরিয়া যাইতেছে। কহিল, তুমি তো আগে আমায় জানাওনি বোন্, যে, আজ তোমার যাবার দিন!

কল্পনা শরদিন্দুর পদতল হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, আমার এখানকার কাজ ফুরিয়েছে। চিরদিন থাক্‌বার জন্যে আমি তো আসিনি! একদিন যেমন অতর্কিতে এসে ছিলুম, তেমনি অতর্কিতে বিদায় নিচ্ছি।

শরদিন্দু মৌন হইয়া বসিয়া রহিল। পরে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া কল্পনাকে বলিল, তবে এখন আমি সম্পূর্ণ একা হ'লুম। যখন আমার বয়স দশ বছর, তখন বাবা একদিন সকলকে আশ্চর্য্য ক'রে দিয়ে স্বর্গে চ'লে গেলেন। দাদা, বৌদি আমায় মানুষ ক'রে একদিন তেমনি সকলকে আশ্চর্য্য ক'রে একসঙ্গেই আমাকে রেখে গেলেন। মা ছিলেন—তিনিও রইলেন না! শিপ্রা আমাকে ছেড়ে চ'লে গেলো। শেষে তুমিও যাচ্ছো বোন্,—আমার যে কিছুই রইলো না, ভাই!

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া আসিল। এবং কল্পনা সেই স্বর অনুসরণ করিয়া শরদিন্দুর মুখপানে তাকাইতেই দেখিতে পাইল—তাহার দুই চক্ষুর কোণ বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে!

কল্পনা বেদনায় অভিভূত হইয়া কহিল, তোমার ভাইপো সুপ্রভাত আছে—সে যে তোমার সবচেয়ে বড়ো সম্পদ, দাদা! এই বলিয়া মুহূর্ত্তমাত্র নির্ব্বাক হইয়া পুনশ্চ কহিল, আর আমি তো তোমাকে ত্যাগ ক'রে যাচ্ছি না, ভাই! কাছে নাইবা রইলুম?

তোমার ছবি নিয়ে যাচ্ছি! না, একে তো ছবি আমি ব'ল্‌বো না! ব'ল্‌বো,—তুমি,—তোমার অন্তরের মূর্ত্তি! যেদিন তোমার দরকার হবে, সেদিন আমি এর কাছ থেকে জান্‌তে পার্‌বো। সেদিন আমি আস্‌বোই, দাদা—এ তুমি ঠিক্ জেনো!

শরদিন্দু চোখ্ মুছিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। এমনি কিছুকাল গত হইলে সে দৃষ্টি ফিরাইয়া কল্পনার দিকে চাহিল, কহিল, তুমি কি একাই যাবে, কল্পনা?

—হ্যাঁ, একাই যাবো। আমার ভয় করে না।

—না, সে হবে না বোন্। আমি ড্রাইভারকে ব'ল্‌ছি, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আস্‌বে। সঙ্গে দ্বারবানকেও পাঠিয়ে দোবো।

এই বলিয়া শরদিন্দু কল্পনাকে কোনো আপত্তি উত্থাপন করিবার সুযোগ না দিয়া, ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আশ্রমে পৌঁছিয়া কল্পনার সর্ব্বশরীর থম্ থম্ করিতে লাগিল। রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। আশ্রমের ফটোক ভিতর হইতে বন্ধ। কল্পনা উঁকি মারিয়া কোথায়ও কাহারো গলার শব্দ অথবা কক্ষে আলো দেখিতে পাইল না। তাহার মন আশঙ্কায় এবং দুশ্চিন্তায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত ইন্দ্রনাথ ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করেন। কিন্তু আজ আশ্রমের ভিতর বাহির একেবারে নিস্তব্ধ। তবে কি ইন্দ্রনাথের শরীর অসুস্থ?

কল্পনা কম্পিতবক্ষে দরজায় আঘাত করিল। এবং ইহার মিনিট্ তিন, চার পরে আশ্রমের একটি মেয়ে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। তাহার হাতে একটি জ্বালা হ্যারিকেন্! কল্পনার মুখের উপর আলোটা উঁচু করিয়া ধরিয়া মেয়েটি হাত নামাইল। কহিল, কে, কল্পনা-দি?

কল্পনা ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, হ্যাঁ, জ্যোৎস্না! কিন্তু তোমার মুখ এতো শুষ্ক কেন, ভাই? আশ্রমের সব খবর ভালো তো?

জ্যোৎস্না কোনো উত্তর না দিয়া, হাতের আলোটা মাটিতে রাখিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিল। তাহার পর কল্পনার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল, এবং অকস্মাৎ অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কল্পনা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদ্বিগ্ন এবং বিচলিত হইয়া উঠিল। জ্যোৎস্নার কাঁধ ধরিয়া নাড়া দিয়া কণ্ঠে ব্যাকুলতার সুর-মিশ্রণে বলিল, কি হ'য়েছে জ্যোৎস্না, আমাকে বল্ না, রে? আমার যে ভেতরে যেতে ভয় ক'র্‌ছে, ভাই!

অশ্রুপাতের পর শোকের মাত্রাটা কিছু পরিমাণে প্রশমিত হইয়া আসে। ক্ষণকাল কাঁদিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে জ্যোৎস্না উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, শিপ্রা, নেই!

—এঁ্যা? কী ব'ল্‌লি—শিপ্রা নেই?

শিপ্রাকে কল্পনা প্রথম হইতে ভালো চক্ষুতে দেখিতে পারে নাই। শরদিন্দুর সহিত তাহার পলায়ন প্রথম দিকটায় তাহাকে

অন্তরে বাস্তবিকই নিরতিশয় আঘাত করিয়া ছিল। সে শরদিন্দুকে মনে মনে ভালোবাসিয়া ছিল। এবং যখন সে বুঝিল, শিপ্রার সহিত তাহার মনের আদান-প্রদান হইয়া গিয়াছে, আর ইহাকেই অবলম্বন করিয়া তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্ট হইয়াছে, তখন, সে শিপ্রাকে পূর্ব্বাপেক্ষা বিষদৃষ্টিতে দেখিতে সুরু করিল। ইন্দ্রনাথের কাছে তাহাদের বিরুদ্ধে অনেক কহিয়াছে। এমন কি শিপ্রা যাহাতে আর আশ্রমে প্রবেশ করিতে না পারে—সে-সম্বন্ধে তাঁহাকে প্ররোচিত করিয়া ছিল।

কিন্তু যে-দিন শিপ্রা শরদিন্দুর কাছ হইতে পুনরায় আশ্রমে ফিরিয়া আসিল এবং ইন্দ্রনাথ সজল-চক্ষে তাহাকে নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন, সে-দিন কল্পনা সম্পূর্ণ বিভিন্ন অনুভূতি সহকারে শিপ্রাকে যাচিয়া নিভৃতে লইয়া গেল ও তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বহুকষ্টে জানিতে পারিল, যে, এতোদিন শরদিন্দুর সহিত এক বাড়ীতে থাকা সত্ত্বেও শিপ্রা নিজেকে কলুষিত করে নাই। এবং শরদিন্দু তাহাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আশ্রমে পাঠাইয়া দেয় নাই—সে-ই স্বেচ্ছায় চলিয়া আসিয়াছে,—সে-দিন সে সত্যই বুঝিল, উভয়ের মনের মধ্যে কিসের একটা ঝড় উঠিয়াছে।

আশ্রমে ফিরিয়া আসিবার পর হইতে শিপ্রা প্রায় সর্ব্বক্ষণ চুপ্ করিয়া জানালার ধারে বসিয়া, বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিত। আশ্রমের কোনো কাজই সে করিতে চাহিত না। অথচ সে-ই পূর্ব্বে কতো আগ্রহের সহিত কাজ-কর্ম্ম, হাসি-তামাসা করিয়া বেড়াইত। ইহাতো কল্পনাও স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

কল্পনা সবই বুঝিয়া ছিল। শিপ্রাকে প্রফুল্ল রাখিতে সে অনেক চেষ্টা ইদানীং করিয়া ছিল। সদাসর্ব্বদাই তাহার কাছে কাছে থাকিতে চাহিত। কিন্তু শিপ্রা যতোদূর সম্ভব তাহাকে এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিত। দেখিয়া শুনিয়া কল্পনার নারী-হৃদয় নারীর জন্যই আন্তরিক ব্যথিত হইয়া উঠিয়া ছিল।

তাহার পর একদিন সহসা যখন শরদিন্দুর পীড়ার সম্বাদ বহন করিয়া লোক আসিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইল, এবং শিপ্রাকে লইয়া যাইবার জন্য মিনতি করিল, তখন ইন্দ্রনাথ যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া ছিলেন,—শরদিন্দুর আদেশ মতে তিনি শিপ্রাকে সেখানে পাঠাইতে পারিবেন না। পূর্ব্বে ইন্দ্রনাথকে এমনি রাগ প্রকাশ করিতে কেহ দেখে নাই। কল্পনা স্পষ্টই বুঝিল, শান্ত-প্রকৃতি ইন্দ্রনাথও শরদিন্দুর পূর্ব্বাচরণ বিস্মৃত হন নাই।

শিপ্রা যখন কল্পনার মুখ হইতে শুনিল—শরদিন্দুর অসুখ এবং তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য সে-ই লোক পাঠাইয়াছে, ও ইন্দ্রনাথের প্রবল আপত্তি তাহাকে সেইখানে পাঠাইতে, তখন সে কাঁদিয়া কল্পনার হাত দুইটি ধরিয়া ছিল! বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া ছিল—কল্পনাদি', ওঁর যে আপনার লোক কেউ নেই! আমি যেতে পারলুম না;—তুমি যাও, দিদি। তাঁকে নিরাময় ক'রে তুলো!

কল্পনা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়া ছিল, অস্থির হ'য়োনা, বোন্! আমি যাবো ওখানে! ভয়ের কারণ কিছু নেই; রোগ হ'লে কি সারে না?

শিপ্রা বলিয়া ছিল, রোগ হ'লে সারে, দিদি—এ আমিও জানি তবু ভগবানের কাছে আমার আপ্রাণ কামনা, তিনি শীগ্যির ভালো হ'য়ে উঠুন্! কিন্তু আমি না গেলে তিনি যে বড্ডো আঘাত পাবেন। হয়তো, আমাকে এর জন্যে কোনো দিনই ক্ষমা ক'র্‌তে পার্‌বেন না।···না, কল্পনাদি'—আমি যাবো। উনি যে আমার স্বামী। স্বামীকে সেবা কর্‌বার অধিকার স্ত্রীর কি নেই?

এই সময়ে ইন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া ছিলেন। শিপ্রার শেষের দিকের কথা কয়টা তাঁহার কানে আসিয়া ছিল। গম্ভীর মুখে কহিয়া ছিলেন, তুমি শরদিন্দুর স্ত্রী নও, সেও তোমার স্বামী নয়। শুধু মনের দিক দিয়ে দেখ্‌লে তো চ'লবে না। আর তা'ছাড়া সে, শুন্‌লুম, আজকাল উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে উঠেছে। আশ্রমের কোনো নিয়মই মেনে চলে না। সে এখন মদ খেতেও সুরু ক'রেছে।

শুনিয়া শিপ্রা বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়া ছিল। ইন্দ্রনাথের মুখে এমন কথা সে কখনো প্রত্যাশা করে নাই। ক্ষণকাল পরে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিয়া ছিল, মিথ্যে কথা। তুমি তাঁকে মদ খেতে দেখেছো?

শিপ্রাকেও ইতিপূর্ব্বে এমন কঠোর হইতে দেখা যায় নাই। বোধকরি তাহার অন্তরে প্রেমাভিজাত্যের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া ছিল।

ইন্দ্রনাথ শিপ্রার কথার উত্তরে বলিয়া ছিলেন, সব জিনিষ চোখে দেখা যায় না। যে-গুলো দেখা যায় না, সে-গুলো

বিশ্বাস ক'র্‌তে হয়—পরের কথায়! কল্পনাও কথাটা অবিশ্বাস করিয়া ছিল। সে প্রতিবাদ করিয়া ছিল, এ অসম্ভব, বাবা। শরদিন্দুবাবু বড়ো লোকের ছেলে হ'তে পারেন,—কিন্তু বড়ো লোকের মতো খাম-খেয়ালী মন তাঁর তো নয়!

ইন্দ্রনাথ উত্তর দিয়া ছিলেন, এ-জগতে অসম্ভব কিছুই নয়, মা। সবই সম্ভব। তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ তো শরদিন্দু নিজেই। সে নিজের বিষয়-সম্পত্তির ভোগ-বাসনা ত্যাগ ক'রে আশ্রমে এসে ছিল। আমার জ্ঞানের যতোটুকু সম্ভব, সবই তাকে দিয়ে ছিলুম। কিন্তু ও তার অসম্মান ক'রে নিজেকে ভোগের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছে।

কল্পনা ইহার উত্তরে কিছু বলে নাই। কিন্তু শিপ্রা বলিয়া ছিল, নিজের বিষয় ভোগ করাটাই যদি তাঁর অপরাধ হয়, তবে এ-কথাও তোমায় ব'লে রাখ্‌ছি, বাবা, যে, তাঁর বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে যারা তাঁকে অন্যায় ভাবে দোষারোপ করে, তারাও তাঁর চেয়ে অপরাধী!

তাহার পর একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া পুনরপি কহিয়া ছিল, কিন্তু আমি জানি, কে তাঁর নামে মিথ্যে অপবাদ রটিয়েছে। লোকের কথার 'পর নিজেকে দুর্ব্বল ক'রে আমার 'পর সবলতা প্রকাশ ক'র্‌ছো। কিন্তু আমার জীবনের গতি যেদিকে যাবে, সেদিকেই আমি নিজেকে ছেড়ে দিতে এখন একটুও ভয় পাইনে!

শুনিয়া ইন্দ্রনাথের সমগ্র মুখমণ্ডল চাপা-ক্রোধে রক্ত-বর্ণ ধারণ করিয়া ছিল। কোনো কথা কহেন নাই। শুধু শিপ্রার একখানা হাত দৃঢ়-মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া, জোর করিয়া অন্য কক্ষে লইয়া গিয়া, বাহির হইতে শিকল তুলিয়া দিয়া ছিলেন।

কল্পনা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া স্থির চক্ষে বাহিরের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া ছিল। ইন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আর কোনো কথা তাহার বলিবার সাহস হয় নাই। তাঁহার অনুমতি যাচনা না করিয়াই সে বাহিরে আসিয়া শরদিন্দুর প্রেরিত মোটরে চাপিয়া বসিয়া ছিল।

ইন্দ্রনাথ শিপ্রার উপর এতোটা নির্দয় কেন যে হইয়া উঠিয়াছিলেন, কল্পনা নির্দ্দিষ্ট হেতু খুঁজিয়া পায় নাই। আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া যখন সে আজ জ্যোৎস্নার ভাবগতিক দেখিল, এবং শিপ্রা নেই, এই কথা শুনিল, তখন সে, কি জানি কি কারণে মনে করিয়া লইল—শিপ্রা আত্মহত্যা করিয়াছে।

নিজেকে সম্বরণ করিয়া কল্পনা কহিল, কবে মারা গেলো?

শুনিয়া জ্যোৎস্না পরম আশ্চর্য্যে চোখ্ তুলিয়া কল্পনার মুখ-প্রতি চাহিল, বলিল, মারা? মারা যাবে কেন? শিপ্রা পালিয়ে গেছে!

—পালিয়ে গেছে? এই কথাটা কল্পনার মুখ দিয়া আপনা হইতে নিতান্তই সহজে, যেনো অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া আসিল। তাহার এখন মনে হইতে লাগিল, ইহা অপেক্ষা শিপ্রার মৃত্যু সম্বাদ শোনা যে শতগুণে শ্রেয়ঃ ছিল! যৌবন-উচ্ছ্বসিত নারীর একস্থান হইতে অন্যস্থানে পালাইয়া যাওয়া লোক-চক্ষুর দিক দিয়া কতো বড়োই না অপ্রিয়! ইহা সত্য—যে শিপ্রার মানসিক অবস্থা লোকে বুঝিবে না। যে স্বেচ্ছায় কলঙ্কের বোঝা নিজের মাথার উপর তুলিয়া লইতে পারে, তাহার

মনের অবস্থা যে কী অসহনীয় তাহা হয়তো চিরদিনই সমাজ-চক্ষে অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিয়া যাইবে। এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া হিতকারী সমাজ যে—দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি করিবে, তাহাতে তৃষ্ণার্ত্ত নারীর অবশিষ্ট জীবনটা মরীচিকার মতো অসম্পূর্ণ ও একান্তই দুর্ব্বিসহ বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে বোধকরি।

কিন্তু ইহাতো ভবিষ্যতের কথা। বর্ত্তমানে শিপ্রা গেল কোথায়? শরদিন্দুর কাছে যায় নাই তো? আশ্চর্য্য কিছুই নয়! উহাকে পাইবাব জন্যই তো তাহার এতো বেশী পিপাসা।

কল্পনা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

— ষোলো —

সংসারে যে-সব লোক পরস্ত্রীর লোভ করে, তাহাদের দলের মধ্যে শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্যকে অনায়াসে ফেলিতে পারা যায়। শিপ্রাকে দেখিবার পর হইতে তাঁহার মন বিচলিত হইয়া উঠিতে বাকী ছিল না। কিন্তু নিজের মনের ভাব সব সময়ে ব্যক্ত করা তাঁহার স্বভাবের বিরুদ্ধ। শিপ্রার ভরা-যৌবন, অনিন্দ্যসুন্দর মুখাকৃতি তাঁহার প্রৌঢ়-বয়সে একটা দুর্ণিবার মাদকতার এবং অধৈর্য্যতার সুর ঝঙ্কার দি। উঠিয়া ছিল।

মানুষ কামনার তৃষ্ণায় মনের নীচতাকে দমন করিতে অক্ষম হইয়া তাহা এক সময়ে বাহিরে প্রকাশ করিয়া ফেলে। মনের ভিতরে যে-মনুষ্যত্ব থাকে, তাহাকে তখন আর খুঁজিয়া পাইবার উপায় থাকে না। এক খণ্ড মসীবর্ণ মেঘের আবরণে সূর্য্য আবৃত হয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মেঘের অপসরণ হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহার মুখ অদৃশ্যই রহিয়া যায়। তেমনি এই মানুষের পশুত্ব এবং মনুষ্যত্ব। পশুত্বের কৃষ্ণাবরণ, মনুষ্যত্বের তীব্র জ্যোতিকে অন্তরালে আকর্ষণ করে।

শরদিন্দুর পীড়ার কথা শম্ভুনাথ শুনিয়া ছিলেন। শিপ্রা আশ্রমে ফিরিয়া গিয়াছে, ইহাও গোপনে গোপনে সম্বাদ রাখিতে বিস্মৃত হন নাই। একটা অনিবারণীয় অবৈধ স্পৃহা, তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতে ছিল। এই স্পৃহা শিপ্রাকে লাভ করিবার

জন্য। শম্ভুনাথ দুই, তিন দিন সর্ব্বক্ষণ চিন্তা করিয়া শেষে কুমতির হস্তেই নিজেকে সমর্পণ করিলেন। করিয়া, একেবারে মরীয়া হইয়া উঠিলেন।

শরদিন্দুর অসুখে শিপ্রা আসে নাই, ইহাও শম্ভুনাথের অবিদিত ছিল না। এবং ইহাই তাঁহার নিকটে মহাসুযোগের রূপ লইয়া দেখা দিল। শরদিন্দু মৃত্যু-শয্যায়, এই মিথ্যা-বাক্যে তাহাকে ভুলাইয়া আশ্রমের বাহিরে আনিলে, তাঁহাকে আর পায় কে? লোককে ফাঁকি দিয়া যে-অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহার সাহায্যে শিপ্রাকে লইয়া, কলিকাতা হইতে দূর দেশে পালাইয়া খাইতে তাঁহার কোনো অসুবিধা হইবে না। সঙ্গে আরো কিছু টাকা রাখিবার অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণীর গহনার বাক্স গোপনে সরাইয়া গহনাগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন!

কিন্তু শিপ্রা যদি সন্দেহ করিয়া বসে? আর ইহার উপর আস্থা করিয়া সে যদি তাঁহার সহিত আসিতে না চাহে, তবে? শম্ভুনাথ এ-সব বিষয়ে দমিয়া যাইবার লোক নহেন। আশ্রমের কর্ত্তা ইন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সম্প্রতি কি একটা সূত্রে বিশেষ পরিচয় হইয়াছে। তিনি যে-প্রকার মানুষ, তাহাতে তাঁহাকে বুঝাইয়া শিপ্রাকে আনিতে ক্লেশ পাইতে হইবে না।

শম্ভুনাথ দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

কল্পনা শরদিন্দুর নিকটে যাইবার পর, শিপ্রা আরো অস্থির হইয়া উঠিয়া ছিল। ইন্দ্রনাথ তাহাকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু সে কয়েক মিনিটের জন্য। পরে

নিজে আসিয়া শিপ্রাকে পরমাদরে হাত ধরিয়া, ঘরের বাহিরে আনিয়া, শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন।

কিন্তু শিপ্রার অভিমানের এবং শরদিন্দুর জন্য ব্যাকুলতার অন্ত ছিল না। একদিন ইন্দ্রনাথ আশ্রমের বাহিরে গেলে, সে সুযোগ বুঝিয়া বাহির হইয়া আসিয়া ছিল—শরদিন্দুর নিকটে যাইবার জন্য।

ঠিক্ এই সময়ে শম্ভুনাথ, আশ্রমের দিকে আসিতে ছিলেন। দূর হইতে শিপ্রাকে দেখিয়া তাঁহার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিয়া ছিল। বিনা প্রয়াসেই তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল! ইন্দ্রনাথের কাছে মিথ্যা কথা বলিয়া সন্দেহের মধ্যে থাকিতে হইল না।

তাহার পর যাহা ঘটিয়া ছিল, অনুমান করা কঠিন নহে। শম্ভুনাথ কৃতকার্য্য হইয়া ছিলেন।

ইহাই হইল—কল্পনার শরদিন্দুর ওখান হইতে অমরাবতী-আশ্রমে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বের কাহিনী।

— সতেরো —

বেহারের সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত কোনো একটা শহরে শম্ভুনাথ শিপ্রাকে লইয়া আসিয়াছেন। শিপ্রা কতো কাঁদা-কাটা করিয়াছে, কতো অনুনয়-বিনয় করিয়াছে, তবু শম্ভুনাথ তাহাকে ছাড়িয়া দেন নাই। ছাড়িয়া দেওয়া তো দূরের কথা, এই সময়ের ভিতর তাহাকে নির্য্যাতন করিতে বাকী রাখেন নাই।

আজ কয়দিন হইল, শিপ্রা একপ্রকার অনাহারে আছে বলিতে হইবে। শম্ভুনাথ একটা পাচক ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া আনিয়া ছিলেন, সে-ই পাক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিত। সে দিন, রাত্রে শিপ্রার কক্ষে ভাত দিয়া, বাহির হইতে তালাচাবি বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিত। ইহাই শম্ভুনাথের আদেশ ছিল।

আজ রাত্রে শম্ভুনাথ পর-পর তিন, চার ছিলিম্ গাঁজা টানিয়া শিপ্রার কক্ষে প্রবেশ করিয়া ছিলেন। রাত্রি খুব বেশী হয় নাই। কিন্তু চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধতায় মনে হইতে ছিল—রাত্রি বহুদূর আগাইয়া গিয়াছে।

কক্ষের একপার্শ্বে যে ক্ষুদ্র জানালা লোহার গরাদে সুরক্ষিত ছিল, তাহার-ই সুমুখে দাঁড়াইয়া শিপ্রা বাহিরের আকাশের পানে চাহিয়া ছিল। তাহার অনেক কথা মনে পড়িল—একদিন রাত্রে অসীমাকাশের নীচে শরদিন্দুর পার্শ্বে বসিয়া সে কতো কথাই না কহিয়া ছিল। মনে পড়িল—একদিন রাত্রে শরদিন্দু নিজের চাদর দিয়া তাহার দেহ আবৃত করিয়া দিয়া ছিল, পাছে

তাহার ঠাণ্ডা লাগিয়া শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে—শরদিন্দুর কতো স্নেহ ইহার মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল! মনে পড়িল—একদা শরদিন্দু তাহাকে গভীর প্রেমে চুম্বন করিয়া ছিল। যৌবনের এই চুম্বনই তাহার সর্ব্বপ্রথম। তাহার মনে হইতে লাগিল, এখনো শরদিন্দুর সেই চুম্বনটি তাহার গণ্ডে তখনকার মতোই যেনো সুস্পষ্ট রূপেই লাগিয়া আছে!

শিপ্রার দুই চক্ষুর কোণ্ বাহিয়া শ্রাবণের ধারার মতো অশ্রু-ধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

শম্ভুনাথ আসিয়া তাহার ঠিক্ পিছনে দাঁড়াইয়া ছিলেন—শিপ্রা লক্ষ্য করে নাই। এক্ষণে উষ্ণ নিঃশ্বাস তাহার পিঠ স্পর্শ করিতেই সে সচকিতে একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া ঘাড় ফিরাইল, দেখিল—শম্ভুনাথ দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছে।

ঘৃণায় শিপ্রার সর্ব্বাবয়ব পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ব্রহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষ যে এমনি পশু হইয়া উঠিতে পারে, তাহা ইতিপূর্ব্বে শিপ্রার জানা ছিল না। সুবিখ্যাত বসু-বংশের কুলপুরহিত, অথচ কি জঘন্য মনোবৃত্তি তাঁহার!

শম্ভুনাথ জবাফুলের মতো রাঙা চক্ষুদ্বয় শিপ্রার মুখের উপর তুলিয়া ধরিলেন। এবং পরক্ষণেই তাহার অবিন্যস্ত এলায়িত দীর্ঘ কেশ-রাশি হাতে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, বাঃ! কী চমৎকার তোমার চুল। সত্যি শরদিন্দুর কপাল ভালো। কিন্তু শম্ভুনাথ ও সহজে তোমায় ছাড়্ছে না। শরদিন্দুর কপাল ভালো, আমার কপালও মন্দ নয়। তোমাকে অনেক কষ্টে পেয়েছি।

শিপ্রা সজোরে নিজের কেশদাম শম্ভুনাথের হাত হইতে মুক্ত করিয়া দূরে সরিয়া গেল, বলিল, আমায় কিসের জন্যে এখানে ধ'রে নিয়ে এলেন? আপনি ব্রাহ্মণ; আপনার একি প্রবৃত্তি? ছেড়ে দিন্ আমায়। আমি শরদিন্দুবাবুর কাছে যাবো। তাঁর যে বড়ো অসুখ!

—মাইরী? ছেড়ে দিন্ ব'ল্লেই দিলুম আর কি! তোমার জন্যে আমি নিজের বংশে কলঙ্ক দিয়েছি, তা' তুমি জানো?

বলিতে বলিতে শম্ভুনাথ শিপ্রার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

—খবরদার্ ব'ল্‌ছি আমায় ছোঁবেন না। আবার এগোচ্ছেন?

বলিয়া শিপ্রা আর এক দিকে সরিয়া দাঁড়াইল। দরজার দিকে চাহিয়া দেখিল, সেটা খিল্ লাগানো রহিয়াছে।

শম্ভুনাথের দেহের রক্তে ও শিরা-উপশিরায় যে লালসার স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, তাহা রোধ করিবার সামর্থ্য তাঁহার কোথায়? কোনো কথাই কানে তুলিলেন না। ক্ষুধার্ত্ত শ্বাপদের ন্যায় শিপ্রার দিকে অগ্রসর হইয়া তাহার কোমল দেহলতাকে নিজের দুই বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন।

এমনি অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া শিপ্রা উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে বিস্মৃত হইল না। আশ্রমে থাকিয়া সে যু-যুৎসুর কতোকগুলি প্যাঁচ্ আয়ত্ত করিয়া ছিল। এক্ষণে তাহার সদ্ব্যবহার করিল। সে শম্ভুনাথের চিবুকের নীচে ডান-হাতের তালু রাখিয়া হাতের দুইটা আঙ্গুল তাঁহার নাসারন্ধ্রে সজোরে প্রবেশ করাইয়া

দিল। এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে দেখা গেল—শম্ভুনাথের দৃঢ় বাহুবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

ব্যাধের শর ব্যর্থ হইলে হরিণী যেমন করিয়া প্রাণভয়ে দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া পালাইয়া যায়, তেমনি শিপ্রা শম্ভুনাথের হাত হইতে মুক্ত হইয়া দরজার খিল্ খুলিয়া বাহিরে আসিল। আসিয়া সুমুখের ফাঁকা পথের উপর দিয়া ছুটিল। চতুর্দ্দিকে সূচিভেদ্য অন্ধকার। শুধু এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে কেরোসিন তৈলের আলো মিট্-মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে।

শিকার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইলে, শীকারীর ক্রোধের এবং জিদের সীমাপরিসীমা বিলুপ্ত হইয়াও থাকে। শিপ্রা দরজা দিয়া বাহিরে আসিবার অনতিকাল পরে শম্ভুনাথও বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পায়ের কাছে একটা ছোটো বাঁশের লাঠি পড়িয়া ছিল, অগ্রসর হইতেই সেটার উপর তাঁহার পা' পড়িল। নত হইয়া লাঠিটা হাতে তুলিয়া লইয়াই শম্ভুনাথ ছুটিলেন এবং খানিকটা পথ অতিক্রম করিয়া আন্দাজে হাতের লাঠিটা শিপ্রার দিকে ছুঁড়িয়া মারিয়া সম্মুখদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

অন্ধকারে ঢিল্ ছুঁড়িলে সময় সময় তাহা কাজে লাগে। বাঁশের লাঠিটা 'শাঁ' করিয়া আসিয়া শিপ্রার বাঁ রগের ধার ঘেঁষিয়া লাগিল। তাহার পর লাঠিটা ঠিক্‌রাইয়া পাশের একটা য়ুকেলিপ টাস্ গাছের গুঁড়ির উপর গিয়া পড়িল।

কিন্তু শিপ্রা নারী। উত্তেজনায় তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে ছিল। তাহার উপর লাঠির প্রহার। সে সহ্য করিতে পারিল

না। কপালটা একখানা হাতের সাহায্যে চাপিয়া ধরিয়া, বসিয়া পড়িবামাত্র তাহার মুখ হইতে সজোরে একটা আর্ত্তনাদের শব্দ নির্গত হইয়া বাতাসের সহিত ভাসিয়া গেল।

এ-পার্শ্বে একখানা একতলা বাড়ীর বৈঠক্‌খানা-ঘরে তখনো আলো জ্বলিতে ছিল। ঐ ঘরে একটি বত্রিশ-তেত্রিশ বছরের যুবক ছোটো একটা কাঠের টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া কাগজের উপর কি লিখিতে ছিল। সহসা তাহার কলমের গতি থামিল। কে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল না? শব্দটা বাহির হইতেই আসিয়াছে। যুবকটি টেবিলের উপরে স্থিত রিষ্ট-ওয়াচ্‌টার দিকে চাহিয়া দেখিল, রাত্রি সাড়ে দশটা। রাত্রি তো বড়ো কম হয় নাই! চোর-ডাকাতের দেশে এতো রাত্রে বাড়ী হইতেই বা কে বাহির হইয়াছে?

যুবকটি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মেঝের উপর একখানা কম্বল পাতিয়া লেপ্ মুড়ি দিয়া, একটি ভৃত্য নিদ্রা যাইতে ছিল। যুবকটি তাহাকে ডাকিয়া বলিল, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। তুই উঠে ব'স্।

এই বলিয়া সে নিজের বিছানার লেপের তলা হইতে একটা শঙ্কর মাছের চাবুক্ এবং একটা তিন্ শেলের টর্চ্চ হাতে তুলিয়া লইয়া, বাহির হইয়া গেল।

* * * *

যুবকটি টর্চ্চের বোতাম্ টিপিল। এবং পরমুহূর্ত্তে সেই আলোকরশ্মির সাহায্যে দেখিতে পাইল—শিপ্রা অদূরে মাটিতে বসিয়া বাঁ-হাত দিয়া কোমরের কাপড়টা চাপিয়া রাখিয়াছে আর

শম্ভুনাথ তাহার কাপড়ের একপ্রান্ত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে।

এমনি বীভৎস-দৃশ্য দেখিবার কোনো আশাই ছেলেটির কল্পনায় আশ্রয় লয় নাই। চক্ষের পলক পড়িল না। ছেলেটির ডান-হাতের চাবুক্‌টা একপাক শূন্যে ঘুরিয়া, শপাং করিয়া শম্ভুনাথের মুখের উপর পড়িল। মুখ হইতে তাঁহার একটা কাতরতার স্বর বাহির হইয়া আসিবার মুহূর্ত্তপরে আরো পাঁচ, ছয় ঘা' তাঁহার পিঠে, হাতে, পায়ে পড়িল। তিনি ভূমিতে পড়িয়া লুটাপুটি খাইতে খাইতে ক্রন্দন-স্বরে বারম্বার শুধু এই কথাই বলিতে লাগিলেন, আমায় প্রাণে মেরো না, বাবা! আমি বাঁমুনের ছেলে।'

ছেলেটির নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়া তখনো উত্তেজনার উষ্ণ নিঃশ্বাস নির্গত হইতে ছিল। সে শম্ভুনাথের কথার জবাব দেওয়াও ঘৃণ্য বলিয়া মনে করিল। একবার রোষদীপ্ত চক্ষে তাঁহার লুণ্ঠিত দেহের দিকে চাহিয়া হাতের চাবুক্‌টা বগলের ভিতর চাপিয়া রাখিল। তাহার পর সন্তর্পণে শিপ্রাকে তুলিয়া দাঁড় করাইয়া কহিল, আপনি সঙ্কোচ ক'র্‌বেন না। আমার ঐ বাড়ী। আপনি আমার সঙ্গে আসুন্।

শিপ্রা কাপড় সুসংযত করিয়া, ধীরে ধীরে ছেলেটিকে অনুসরণ করিল।

পরদিন ছেলেটি এক সময়ে শিপ্রার ঘরে আসিয়া একখানা

চেয়ার তাহার শয্যার কাছে টানিয়া লইয়া, উহার উপর বসিল, কহিল, কপালের ব্যথাটা কি এখনো খুব্ বেশী আছে ?

শিপ্রা শুইয়া ছিল। আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিয়া ব্যাণ্ডেজ্‌টার উপর একখানা হাত রাখিল, বলিল, ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। এখানটা বড্ডো টাটিয়েছে !

ছেলেটি ব্যস্ত হইয়া কহিল, তাহ'লে একবার ডাক্তারকে কল্ দিয়ে আসি। সেফ্‌টিক্ হবার ভয় আছে।

বলিয়াই সে চেয়ার ছাড়িয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল। শিপ্রা পূর্ব্বাপেক্ষা নীচু স্বরে বলিয়া উঠিল, আপনি অতো ব্যস্ত হবেন না। দুঃখ, কষ্ট সহ্য করা আমাদের জন্ম হ'তেই পাওয়া। আপনি ভয় ক'র্‌ছেন, কিন্তু আমি জানি ওসব কিছুই আমার হবে না। মেয়েরা সহজে মর্‌তে চায় না! আপনি ব'সুন্— দাঁড়িয়ে রইলেন যে ?

ছেলেটি সুস্পষ্ট রূপেই বুঝিতে পারিল, শিপ্রার এই কথা গুলির মধ্যে বেদনার সুর মিশ্রিত হইয়া আছে। গতরাত্রে তাহাকে সেই অকল্পিত অবস্থায় দেখিয়া তাহার কৌতূহল হইয়া ছিল, শিপ্রার সম্বন্ধে কিছু জানিবার জন্য। কিন্তু কাল তাহাকে লইয়া প্রায় সারারাত্রি সে শুশ্রূষায় লিপ্ত ছিল, সুতরাং সুযোগ হয় নাই। আজ সেই কৌতূহল আরো প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সে পুনরায় যথাস্থান অধিকার করিয়া নিজের পায়ের দিকে অনর্থক চাহিয়া কহিল, আমি না হয় নাই গেলুম। কিন্তু ডাক্তার ডাকা দরকার। আমি চাকরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি যখন আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমার বাড়ীতে এসেছেন, তখন আমার কর্ত্তব্য আমি ক'র্‌বোনা?

এই বলিয়া ছেলেটি ভৃত্যকে ডাকিয়া চিকিৎসকের বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

শিপ্রা কোনো আপত্তি করিল না। ছেলেটির কথাগুলি ভারী মিষ্ট। শিপ্রার দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

গোপনে চক্ষু মুছিয়া শিপ্রা বলিল, ওকথা ব'ল্‌লে, আমার পাপ হয়। আমি অনুগ্রহ ক'রে এসেছি, না, আপনি পরম অনুগ্রহে আমাকে বাঁচিয়ে মাথা রাখবার জায়গা দিয়েছেন?

শুনিয়া ছেলেটি ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন করিয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু এক সময়ে সহসা শিপ্রার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস ক'র্‌বো, অপরাধ নেবেন না। আমার কৌতূহল ডেড়ো বেশী।

শিপ্রা স্থিরচক্ষে চাহিয়া বলিল, ওকি কথা আপনি ব'ল্‌ছেন? আমি বয়েসে আপনার চেয়ে অনেক ছোটো। আপনার অপরাধ নেবার যোগ্যতা আমার নেই। ব'লুন্, আপনি কি জান্‌তে চান্। আমি আপনাকে কোনো কথা গোপন ক'র্‌বোনা। দাদার কাছে, ছোটো বোন্ প্রতারণা ক'র্‌তে পার্‌বে না।

—আমি, আপনার,—তোমার দাদা? কিন্তু আমাকে যে কেউ দাদা বল্‌বার নেই—কেউ আগে 'দাদা' ব'লে ডাকেনি তো? আমার যে অনেক দোষ। আমি কল্পনার, না থাক্। আমাকে তুমি দাদা ব'ল্‌বে?

শিপ্রা জোর দিয়া বলিল, হ্যাঁ তুমিই আমার দাদা! তোমাকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণেই দাদা ব'লে ডাক্‌বো। এ-ডাকে কোনো সঙ্কোচ থাক্‌বে না, কোনো সঙ্কীর্ণতাও প্রশ্রয় পাবে না।

—কিন্তু আমার যে অনেক দোষ! আমি মাতাল; মদ না হ'লে আমার দিন চলে না। আমি ব্যাধের মতো ভবঘুরে; কোথাও স্থায়ীভাবে থাক্‌তে পারিনে। আমার মেজাজ ভারী রুক্ষ; একটুতেই রাগে নিষ্ঠুর কাজ ক'রে ফেলি। কিন্তু এসব দোষ আগে আমার ছিল না। কল্পনাকে নির্ম্মমের মতো তাড়িয়ে দেবার পর থেকে, এই রকম হ'য়ে গেছি। এখন খালি মনে হয়, ওকে একবার দু'চোখ্ ভ'রে দেখে নি। ওর হাত ধ'রে ক্ষমা চেয়ে বলি, তুমি আমায় শাস্তি দাও।

বলিতে বলিতে ছেলেটির দুই চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল।

শিপ্রা ইহা লক্ষ্য করিল, কহিল, ছিঃ দাদা! কেঁদোনা, কাঁদ্‌তে নেই। তোমরা পুরুষ মানুষ হ'য়ে যদি বুক বাঁধ্‌তে না পারো, তবে আমরা কাদের আশ্রয়ে থাক্‌বো?

ছেলেটি জামার আস্তেনে চোখ্ মুছিয়া বলিল, পারিনা বোন্। বুকের ভেতরটা কেমন করে। কল্পনাকে ভুল্‌তে চেয়েছি, কিন্তু পারিনে।

—তাকে কি তুমি খুব বেশী আঘাত দিয়েছো, দাদা?

শুধু আঘাত? তার বুকের ভেতরটা চুরমার ক'রে দিয়েছি। তার জীবনের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে কে,—সে তো আমিই!

শিপ্রা মনে মনে অতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, তুমি বড্ডো দুর্ব্বল দাদা, তোমার শরীরের সামর্থ্য যেমন, তেমনি মনের দৌর্ব্বল্য। তুমি আমার কথা শুন্‌তে গিয়ে, নিজের মনের কথা ব্যক্ত ক'রে ব'সেছো।

—আমি ভাবপ্রবণ লোক। এতোদিন লোকের অভাবে এ-সব নিজের বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে ভয়ানক হাঁপিয়ে উঠে ছিলুম। এখন মনে হ'চ্ছে বোন্, বুকটা কিছু হাল্‌কা হ'য়ে এসেছে। আচ্ছা, তোমার কথা বলো ভাই। কিন্তু লজ্জা ক'রোনা।

—লজ্জা-সঙ্কোচ কিছুই আমি তোমার কাছে ক'র্‌বো না, দাদা। আমাকে তুমি রক্ষা ক'রেছো, এর ঠিক্ দাম কি আমি কখনো দিতে পার্‌বো?

এই বলিয়া শিপ্রা ক্ষণকাল চুপ্ করিয়া থাকিয়া তাহার জীবনের সমস্ত পূর্ব্ব-ইতিহাস হইতে বর্ণনা করিয়া কল্যকার বীভৎস ঘটনার পূর্ব্বে আসিয়া থামিল। কল্পনার বিষয়েও সে কোনো কথা গোপন করিল না। ছেলেটির সুমুখে সবই প্রকাশ করিল।

শিপ্রার কথা গুলি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে ছেলেটি শুনিয়া গেল। শুনিয়া সে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আশ্রমের কল্পনা যে তাহার-ই কল্পনা,—সে বিষয়ে কণামাত্রও তাহার দ্বিধা বা সন্দেহ রহিল না। সে আসন ত্যাগ করিয়া কি বলিতে যাইতে ছিল, কিন্তু এমনি সময়ে ভৃত্য চিকিৎসকসহ ঘরে প্রবেশ করিল।

ডাক্তার শিপ্রার ক্ষত দেখিয়া ছেলেটির মুখপ্রতি চাহিলেন, কহিলেন, আশঙ্কার কিছুই নেই, সুকোমলবাবু। দু'-চার দিনে ঘা' শুকিয়ে যাবে। একটা ওষুধ আমি দোবো। গরম জলে ক্ষত স্থানটা ধুয়ে সেটা প্রত্যহ দু'বার ক'রে লাগাবেন। চাকরকে

একটু পরে আমার ওখানে পাঠিয়ে দিন্ ওষুধ ওর হাতে দিয়ে দোবো।

ডাক্তার ফিস্ লইয়া প্রস্থান করিলেন।

ইহার দিনকতোক পরে শিপ্রা সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া উঠিল। সুকোমল একদিন তাহার কাছে আসিয়া কহিল, শিপ্রা, আমরা এবার ক'ল্‌কাতায় যাবো। আজ বারোটায় একটা ট্রেণ্ আছে। মনে ক'র্‌ছি, আজই তোমায় নিয়ে রওনা হ'য়ে প'ড়ি। তোমার কি মত, বোন্?

শিপ্রা আনতমুখে সুকোমলের একটা ফ্লানেলের পাঞ্জাবীতে বোতাম্ বসাইতে ছিল। তলায় একটা ফোঁড়্ দিয়া মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল, বলিল, ক'ল্‌কাতায় যাবো—সে কি? আমি যে তোমায় ব'ল্লুম, আমাকে আশ্রমে রেখে আস্‌তে! সেখানে তো কল্পনার সঙ্গে তোমার দেখা হ'তো, দাদা!

—আমার নিজের স্বার্থটা বড়ো ক'রে দেখ্‌বো? সে রকম মন আমার নয়, শিপ্রা! তুমি যে সেদিন ব'ল্লে, শরদিন্দুবাবুর অসুখে তুমি তাঁকে দেখ্‌তে যাবে। আর আশ্রমে ফিরে যাবার কথা তো বলোনি, বোন্! তুমি যদি ওখানেই যেতে চাও,—চলো—রেখে আসি।

শিপ্রা ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিল। পরে মুখ নত করিয়া বলিল, কিন্তু দাদা, আমার আশ্রমে যেতে বড্ডো ভয় করে। আশ্রমের কর্ত্তা কি এবারও আমায় ক্ষমা ক'র্‌বেন? তোমাকে তো ব'লেছি দাদা, ঐ শম্ভুনাথ লোকটা ওঁকে হাতের মধ্যে এনে ফেলেছে। ও হয়তো গিয়ে, আমার নামে মিথ্যে অপবাদ

রটিয়েছে। না, আশ্রমে আমি যাবো না। চলো ক'ল্‌কাতায়ই যাই। শরদিন্দুবাবুর পায়ে মাথা রেখে সব কথা ব'ল্‌বো। তিনি আমাকে যেমন বিশ্বাস করেন, বোধহয় নিজেকেও ততো করেন না।

শুনিয়া সুকোমল ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল, কহিল, আশ্রমের কর্ত্তা ইন্দ্রনাথ, যিনি তোমার পালক পিতা, শিপ্রা, তিনি যদি এতো দিনেও তোমাকে বুঝ্‌তে না পেরে থাকেন, তবে তাঁর ধর্ম্মপথে এতোকাল চলায় ফাঁকি আছে বুঝ্‌তে হবে। শম্ভুনাথ বাইরের লোক। ইন্দ্রনাথ তোমায় মানুষ ক'রেছেন, ঠিক্ সংসারী লোকের মতো স্নেহ দিয়ে, এ'কথা তুমিই ব'লেছো। তোমাকে তিনি অবিশ্বাস ক'র্‌বেন, আর যতো আস্থা উনি খুঁজে নেবেন, ঐ জানোয়ারটার মিথ্যে কথায়—এ হ'তেই পারে না, শিপ্রা!

শিপ্রা মুখ তুলিয়া বলিল, খুব হ'তে পারে, দাদা! বাপ্ নিজের মেয়েকে বিশ্বাস করে না, বাড়ী থেকে মেয়ে বেরিয়ে এলে, সমাজকে পাবেন ব'লে, তিনি নিজের মেয়ের মায়াও ত্যাগ ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হন্ না। আর আমি তো তাঁর পালিত-কন্যা। আমাকে অবিশ্বাস করা তো তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়, দাদা!

সুকোমল সম্মুখের তক্তাপোষ খানার উপর নিঃশব্দে বসিয়া গম্ভীর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। শিপ্রার উক্তিতে তাহার মনে পড়িল, পূর্ব্বকার কাহিনী।—সে শুনিয়া ছিল, কল্পনা গৃহে ফিরিয়া গিয়া ছিল, কিন্তু সেখানে তাহার স্থান হয় নাই। তাহার জন্মদাতা অম্লান বদনে তাহাকে বিতাড়িত করিয়া ছিলেন।

তাহাকে বহুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিতে দেখিয়া শিপ্রা মনে মনে যারপর নাই উদ্‌গ্রীব এবং ব্যথিত না হইয়া পারিলনা। সে উঠিয়া ধীরে ধীরে সুকোমলের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। একটু পরে কহিল, কি ভাব্‌ছো, দাদা?

সুকোমল একটা চাপা নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, ভাব্‌ছি, তোমার কথাই ঠিক্, শিপ্রা! কল্পনার বাবাও ওকে সমাজের জন্যে ঘরে স্থান দেন্ নি!

—সে আমিও জানি, দাদা। কল্পনা আমার কাছে প্রকাশ করেনি বটে, তবু আমি ওকে পরে বুঝে ছিলুম। ওর অন্তরের বেদনা বড়ো কম নয় দাদা, এ তুমি জেনো!

—তোমাকে কোনো কথাই গোপন ক'র্‌তে ইচ্ছা হয় না। মাত্র সামান্য দিনের পরিচয়, তবু মনে হ'চ্ছে, তুমি-ই আমার কতো কালের ছোটো বোন্।

এই বলিয়া সুকোমল মিনিট খানেক চুপ্ করিয়া থাকিয়া পুনর্ব্বার কহিল, আমি জীবনে কী ভুল-ই না ক'রেছি, শিপ্রা! কল্পনা আমার জন্যেই ওর নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ হেলায় হারিয়েছে। আমাকে প্রাণ দিয়ে সে চেয়ে ছিল বোন্, কিন্তু আমি এতোই পাষাণ যে, তার সে-চাওয়ায় অন্তরের সঙ্গে সাড়া দিইনি। মানুষকে আঘাত দিয়ে চেনা যায়। নিজেকে চিনলুম—যখন সুবিবেক এসে আমার মনের কোণে বিষাক্ত-শর নিক্ষেপ ক'র্‌লে। সেই বিষে আমি মরি নি। মরাই হয়তো আমার উচিত ছিল। কিন্তু না, সেযে সব জ্বালা জুড়িয়ে দিতো, জীবনটাকে তিল্ তিল্ ক'রে ক্ষয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, ধ'র্‌লুম, মদ। অথচ এই

মদকে আমি নরকের কীটের মতোই ঘৃণা ক'র্‌তুম। সাহিত্য ছিল আমার জীবনের চরম শান্তির বস্তু। নিজের ওপর রাগ ক'রে, অভিমান ভরে সাহিত্য ত্যাগ ক'র্‌লুম। যাতে শান্তি পেতুম, সুখ আস্‌তো সারা প্রাণে, সবই স্বেচ্ছায় দূরে ঠেলে দিলুম। যাকে নিজের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য দিয়ে, উপেক্ষা ক'রে ছিলুম,—তাকেই স্মরণ ক'রে আমার অন্তরের যে-সব জিনিষ ঘৃণ্য ছিল, তাই বরণ ক'রে নিয়েছি। কিন্তু এখন, আমার ভালো হ'তে বড়ো ইচ্ছা হ'চ্ছে বোন্, তুমি আমাকে মদ ছাড়াতে পার্‌বে?

—পার্‌বো বৈকি, দাদা। নইলে, এমনিই কি তোমার বোন্ হ'য়েছি?

সুকোমল ভাবাবেগে এবং অন্তরের যাতনায় কাঁদিয়া ফেলিল! শিপ্রা তাহার চোখের জল কাপড়ের অঞ্চলের সাহায্যে মুছাইয়া কহিল, অনুশোচনা মানুষের সর্ব্বদোষ ধুয়ে দেয়। মানুষকে যখন মানুষ প্রাণ দিয়ে চায়, তখন বিশ্বের যতোকিছু গত ভুল কর্ম্ম সবই বিলুপ্ত হ'য়ে যায়, দাদা! তোমার অনুশোচনাই তোমাকে আবার আগের মানুষ ক'রে তুল্‌বে।

বলিয়া সে কিছুকাল চুপ্ করিয়া রহিল, তাহার পর আবার কহিল, যাকে না পেয়ে নিজের ওপর অভিমান ক'রে নিজেরই ক্ষতি ক'রতে চ'লে ছিলে, তাকে যদি তোমার হাতে দিতে পারি দাদা, তবে তুমি তাকে বিয়ে ক'র্‌বে,—নিজের ক্ষতি পূরণ ক'রে আবার তার দিকে চাইবে, এ-বিশ্বাস আমার আছে, দাদা।

—আমার ওপর তোমার এতো বিশ্বাস বোন্?

—তোমার ওপর আমার অনন্ত বিশ্বাস, দাদা! আমার কাহিনী শুনে যে আমাকে বিশ্বাস ক'র্‌তে পেরেছে, তার মন অবিশ্বাস্য নয়, এ আমি জানি। কিন্তু আর নয় দাদা, ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখো ন'টা বাজে। তুমি চান্ সেরে নাও। আমি কুয়ো থেকে জল তুলে রেখেছি।

সুকোমল উঠিতে উঠিতে কহিল, কিন্তু কল্পনা যদি আমাকে না চায়, শিপ্রা? তার তো অভিমান আছে, সেও তো মানুষ বোন্! তুমি ব'লেছো,—কল্পনা এখন আশ্রমে পূজো-অর্চ্চনা নিয়ে আছে। নিজেকে ধর্ম্মের পথে ছেড়ে দিতে সে মন-প্রাণ নতুন সুরে গেঁথেছে! আমার মতো প্রতারকের দিকে সে কি আর ফিরে চাইবে?

সুকোমলের এই কথা শ্রবণে শিপ্রা এক মিনিট্ নীরবে চিন্তা করিয়া বলিল, তোমার ভুলকে এখনো কল্পনা যদি অশ্রদ্ধা ক'রে থাকে, তবে তার ভুলের অন্ত থাক্‌বে না, দাদা। কিন্তু তুমি ঠিক্ জেনো,—কল্পনার আশ্রমে এসে ধর্ম্ম-পথকে বেছে নেওয়ার মধ্যে যে-সত্যটা সুকুমার মূর্ত্তিতে অবস্থান ক'র্‌ছে, সে-মূর্ত্তিটা তোমাকে আবার ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষায় প্রতিভাত হ'য়ে উঠেছে। সীতা বাল্মীকির আশ্রয়ে থেকে রামচন্দ্রকে কি মুহূর্ত্তের জন্যেও মন থেকে পৃথক ক'র্‌তে পেরে ছিলেন?

—আমি তো রামচন্দ্র নই! রামচন্দ্র সর্ব্বগুণে ভূষিত ছিলেন, —আমি সর্ব্বদোষে কলঙ্কিত।

শিপ্রা সুকোমলের কথার প্রতিবাদেই হয়তো কি বলিতে যাইতে ছিল। কিন্তু তাহার কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির হইবার

পূর্ব্বেই বাহিরে একটা ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া থামিবার শব্দ হইল।

গাড়ী হইতে সর্ব্বাগ্রে নামিলেন, ইন্দ্রনাথ। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘেরিয়া, মোলস্কিনের র‍্যাপার। মাথার চুল অত্যন্ত ছোটো করিয়া ছাঁটা। দেখিয়া মনে হইল, তাঁহার শরীর অনেকটা ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে।

তাহার পর পথের উপর পা' দিল, শরদিন্দু। এই দুই জনকে একত্রে এমনি অপ্রত্যাশিত ভাবে এখানে আড়াল হইতে দেখিয়া, শিপ্রার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না।

উভয়েই ঘরে ঢুকিল। সুকোমল আশ্চর্য্যে ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল, সবিনয়ে প্রশ্ন করিল, আপনারা কাকে চান্?

ইন্দ্রনাথ সে কথার উত্তর দিলেন না। সহসা শিপ্রার দিকে চোখ্ পড়িতেই তিনি ব্যাকুল হইয়া সে দিকে ছুটিয়া গেলেন, এবং তাহাকে নিজের বক্ষের মধ্যে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই, শিপ্রা তাঁহার পাদদেশে অকস্মাৎ নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল, পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার পদদ্বয় নিজের দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া, কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল, বাবা, আমায় ক্ষমা করো। আমার নিজের স্বার্থের জন্যে আমি তোমার মনে আঘাত দিয়েছি।

ইন্দ্রনাথের দুই চক্ষু, দেখিতে দেখিতে অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি শিপ্রাকে পরম স্নেহে তুলিয়া নিজের বক্ষের উপর তাহার মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া পুনঃপুনঃ শুধু এই কথাই বলিতে লাগিলেন, ক্ষমা তুই-ই আমায় কর্, মা। তোর ওপর

আমি বড়ো নিষ্ঠুর ব্যবহার ক'রেছিলুম। এখন বুঝেছি, তোদের ভালোবাসা, ভগবানের সঙ্গে ভক্তের ভালোবাসার চেয়েও মধুর। আমি ধর্ম্মকে আশ্রয় ক'রে ভগবানকে পাইনি, তোরা মানুষকে আশ্রয় ক'রে ভালোবাসা পেয়েছিস্।

একটু পরে আত্মসম্বরণ করিয়া ইন্দ্রনাথ ইঙ্গিতে শরদিন্দুকে কাছে ডাকিলেন। সে নীরবে সংযত ভাবে আদেশ পালন করিলে, তিনি শিপ্রার বাঁ-হাতখানা তাহার ডান-হাতে তুলিয়া দিয়া উপর দিকে চাহিলেন, বলিলেন, ওপরে ভগবান সাক্ষী রইলেন। বিপদে-আপদে, ধৈর্য্যে-অধৈর্য্যে সুখে-দুঃখে, পতনে-উত্থানে—আজ সত্যই শিপ্রা, মা আমার, তুই শরদিন্দুর স্ত্রী হবার উপযুক্ত। মুখ নামাইয়া শরদিন্দুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, মানুষ জীবনে অনেক ভুল করে, বাবা। কিন্তু এই ভুলের মধ্যে যখন সত্যকে তার নিজের সত্য-মূর্ত্তি দিয়ে দেখা যায়, তখন সে ঠিক্ পথে চ'ল্‌তে শেখে। তোরা দুটিতে সংসারী হ'য়ে দশজনের মতো গৃহী হ'য়ে ওঠ্—আজ পরমেশ্বরের কাছে আমার এই মিনতি।

তাহার পর ইন্দ্রনাথ বিস্মিত সুকোমলের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তাহার মাথায় নিজের ডান-হাতখানা রাখিয়া গদ-গদ ভাবে কহিতে লাগিলেন, তোমায়ও আমার মঙ্গলাভিপ্রায় জানাচ্ছি। তুমি শিপ্রার নারী-ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রেছো—এ'কথা আমি শম্ভুনাথের কাছ থেকে শুনেছি। সে নিজের অপকর্ম্ম আমার কাছে স্বীকার ক'রেছে। তারই মুখ থেকে শুনে ছিলুম,—শিপ্রা তোমার এখানে আছে। একদিন যা'

অপরিষ্কার ছিল, সেদিন তা' স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট হ'য়ে আমার চোখের সুমুখে ভেসে উঠ্‌লো।

এই অবধি বলিয়া ইন্দ্রনাথ তিন, চার সেকণ্ড চুপ্‌ করিয়া থাকিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, শরো, শিপ্রার অনুসন্ধানে দিন কয়েক কী অস্থির না হ'য়েই উঠে ছিল, বাবা। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই, নিদ্রা নেই—কেবল শিপ্রা, শিপ্রা গেলো কোথায়? নিজেকে আর ঠিক্‌ রাখতে পার্‌লুম না। একদিন শরোর বাড়ীতে গিয়ে ওকে সব খুলে ব'ল্লুম। ও শম্ভুনাথকে সাজা দেবার জন্যে ক্ষেপে উঠ্‌লো। আমি সান্ত্বনার স্বরে ব'ল্লুম, ব্রাহ্মণের ছেলে—ছেড়ে দাও, শরো। ও নিজের যা' ক্ষতি করেছে, তোমার সাজা দেওয়ার চেয়ে তার গুরুত্ব অনেক বেশী। শরো আর দ্বিতীয় কথাটি ব'ল্লেনা।

সুকোমল নত হইয়া, ইন্দ্রনাথের পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, শিপ্রাকে আমি আমার বোনের ভেতর দিয়ে পেয়েছি। আমার নিজের বোন্‌ নেই, ভাই নেই, আত্মীয় স্বজন আমাকে পরিত্যাগ ক'রেছে। কিন্তু দৈবঘটনায় যখন ওর দেখা পেলুম তখন বুঝ্‌লুম—আমার মনের কষ্ট বোঝ্‌বার অন্ততঃ একটি লোকও আছে। আজ শিপ্রার সঙ্গে শরদিন্দুবাবুর সাক্ষাৎ হ'লো। আমার আনন্দ রাখবার জায়গা নেই।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে কিয়ৎক্ষণ চুপ্‌ করিয়া রহিল। পরে শরদিন্দুর কাঁধে একখানা হাত রাখিয়া পুনশ্চ কহিল, ভাই, তুমি ভাগ্যবান। যাকে চেয়ে ছিলে, তাকেই আজ সম্পূর্ণ ভাবেই লাভ ক'রেছো। ভগবান আছেন কি না, জানিনে। জান্‌বার আমার

পরিপূর্ণতাও নেই। তবে যে অনন্তশক্তি এই বিশ্বকে পরিচালিত ক'রে আস্‌ছে, সে-শক্তিকে আমি বিশ্বাস করি। আজ সেই অনন্ত-শক্তির কাছে আমার আন্তরিক প্রার্থনা—তোমরা নিজেদের ঈপ্সিত জীবন যাপন ক'রে ভালোবাসার অক্ষুণ্ণতা রেখে যেতে পাবো।

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, এবং সেই স্বর অনুসরণ করিয়া ইন্দ্রনাথ তাহার মুখ-প্রতি চাহিলেন, দেখিলেন, তাহার দুই চক্ষু অশ্রুতে চক্‌-চক্‌ করিতেছে।

ইন্দ্রনাথের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এই ছেলেটির অন্তরের কোনো স্থানে বেদনার সমুদ্র বহিয়া চলিতেছে। কহিলেন, তোমার নাম জানিনে, কিন্তু তোমার কথায় বোঝা যায়, তুমি সুকোমল। তোমার মন, পুষ্পের মতোই কোমল।

শিপ্রা বলিয়া উঠিল, তোমার অনুমান মিথ্যে নয়, বাবা। আমার দাদার নাম—সুকোমল। কল্পনার...

সুকোমল বাধা দিয়া কহিল,—শিপ্রা?

শুনিয়া শিপ্রা থামিল বটে, কিন্তু ইন্দ্রনাথের এবং শরদিন্দুর কৌতূহল জাগিয়া উঠিল।

ইন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে কহিলেন, কল্পনা, কি শিপ্রা?

শিপ্রা সুকোমলের মুখের দিকে চাহিয়া অনুমতির অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সুকোমল ইন্দ্রনাথের হাতখানা আপনার হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল, বলিল, আপনি-ই আমাকে বাঁচাতে পার্‌বেন—আপনার কাছে মৃত-সঞ্জীবনী-সুধা আছে! কিন্তু সে অনেক কথা, এখন

থাক্। এখন আপনারা ভেতরে চ'লুন্। আপনাদের আদর-আপ্যায়নের যতোদূর সাধ্য ক'র্‌বো—অপরাধ নেবেন না।

এই বলিয়া সে কাহাকেও কোনো আপত্তি করিবার অবকাশ না দিয়া, সকলকে সাদরে ভিতরে লইয়া গেল।

— আঠারো —

যথোচিত আহারাদির পর ইন্দ্রনাথ একখানা কৌচে অর্দ্ধ-শায়িতভাবে বসিয়া সুকোমলের সমুদায় কথা শুনিয়া গেলেন। শরদিন্দু এবং শিপ্রা ইন্দ্রনাথের পায়ের নীচে বসিয়া নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। শরদিন্দুর প্রেমময় অন্তঃকরণ বাস্তবিকই সুকোমলের জন্য কাঁদিয়া উঠিল। জীবনে ভ্রম-বশে একটা গর্হিত কাজ করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়াই কি তাহার সমস্ত বাকী-জীবনটা ব্যর্থ হইয়া যাইবে?

ইন্দ্রনাথ গভীরতার সহিত গালে হাত দিয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া সুকোমলকে কহিলেন, মনে করো, কল্পনা এখন তোমাকে যদি বিয়ে ক'র্‌তে না চায়? ও যেমন আজকাল ঠাকুর-দেবতা, পূজো-অর্চ্চনা নিয়ে প'ড়েছে তাতে মনে হয় না যে, ওর সংসারী হবার সাধ আছে। একদিন কল্পনা আমাকে কি ব'ল্লে জানো? ব'ল্লে, শরদিন্দুবাবুর সঙ্গে শিপ্রার বিয়ে দিয়ে দিন্ বাবা। তারপর আপনাতে আমাতে তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়াবো। যে-সব মেয়ে-ছেলে পথে-পথে ভিক্ষে ক'রে বেড়াচ্ছে দেখ্‌তে পাবো,—তাদের বুকে ক'রে তুলে এনে আমাদের নতুন-প্রতিষ্ঠিত ভবনে অন্ন-বস্ত্র দিয়ে প্রতিপালন ক'র্‌বো। যারা লেখাপড়া শেখেনি, তাদের বিদ্যাদান ক'র্‌বো; শিল্পকাজ শেখাবো।

পুনশ্চ কহিলেন, তোমরা বোধহয় জানো না শিপ্রা, সুকোমল যে, শরদিন্দু হিন্দুর বিখ্যাত তীর্থস্থানে একটা ক'রে বিরাট ভবন প্রতিষ্ঠা ক'রবার সঙ্কল্প ক'রেছে।এতে ওর প্রায় পাঁচ-ছ' লক্ষ টাকা ব্যয় হ'য়ে যাবে। কাশী এবং বৃন্দাবনে দু'টো মস্ত বাড়ী কেন্‌বার বায়না শরো দিয়েছে। বৃন্দাবনে যে-ভবন প্রতিষ্ঠা ক'রবে, তার নাম ও-ক'রেছে—শিপ্রা-ভবন্; আর কাশীরটার নামকরণ হ'য়েছে —কল্পনা-আশ্রম। এমন মহৎ কাজ তোমরা কেউ কখনো শুনেছো?

শুনিয়া আনন্দে এবং ভক্তিতে শিপ্রার চোখে জল আসিয়া পড়িল। সে চকিতে একবার শরদিন্দুর মুখ-প্রতি চাহিল। মনে মনে বলিল, তোমাকে ভালোবেসে আমি ধন্য হ'য়েছি।

সুকোমলের চিত্ত এই তরুণ ছেলেটির মহানুভবতায় সত্য-সত্যই পুলকিত এবং কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কাশীর নব-প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের নাম যে তাহার-ই কল্পনার নামানুসারে করিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছে, ইহা সে বুঝিয়াছে। শরদিন্দুর ঐশ্বর্য্যের গুরুত্বের কথা সে কিছু-কিছু শিপ্রার মুখ হইতে একদা শ্রবণ করিয়া ছিল বটে, কিন্তু ঐশ্বর্য্য থাকিলেই যে সে মহৎ কার্য্যে তাহা প্রচুর পরিমাণে দান করিতে সক্ষম হইবে, এমনি চিন্তা বা কল্পনা তাহার মনে ইতিপূর্ব্বে আসে নাই। আজ তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, শরদিন্দুকে দুই হাতে গভীর হৃদ্যতার সহিত আলিঙ্গন করিয়া বলে, ভাই, তোমার সৎ-ইচ্ছার অন্ত নেই। তুমি শুধু অর্থের ঐশ্বর্য্যেই ঐশ্বর্য্যশালী নও। তুমি অন্তরের দিক দিয়েও অনেককে পরাজিত ক'রেছো।

কিন্তু মনের ইচ্ছাকে প্রাণপণে দমন করিয়া সে ইন্দ্রনাথের দিকে ফিরিয়া চাহিল। মুখ নত করিয়া বলিল, আমার ইতিহাস সব-ই তো আপনার কর্ণগোচর ক'র্‌লুম। আপনি সমস্তই বুঝ্‌তে পেরেছেন। আপনি জ্ঞানী, দয়াশীল, চরিত্রবান। বলুন, আমার এখন কি করা উচিত?

বলিয়া সে থামিল, এবং ইন্দ্রনাথ সে-কথার উত্তরে কিছু বলিবার উপক্রম করিতেই সুকোমল মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া পুনরপি কহিল, আমার অর্থের জোর তেমন নেই। আমি শরদিন্দুর মতো অমন মহৎ কাজও ক'র্‌তে পার্‌বোনা। কিন্তু আপনার শিষ্য হ'বার মতো মনের জোর আমার আছে।

বলিতে বলিতেই সুকোমল নিজের আসন হইতে উঠিয়া ভাবের ও ভক্তির আতিশয্যে ইন্দ্রনাথের পায়ের কাছে স্থান করিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল এবং পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার পা'দুইটি হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল।

ইন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি সোজা হইয়া বসিলেন। পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুকোমলের দুই হাত ধরিয়া তুলিয়া, পরম স্নেহজড়িত স্বরে কহিলেন, তোমার মনের জোর আছে, তার পরিচয় আমি পেয়েছি, বাবা! নইলে, সেই রাত্রে একলা এই চোর-ডাকাতের দেশে, শিপ্রাকে রক্ষা ক'র্‌তে ছুটে আস্‌তে না।—আমার শিষ্য, তোমায় ক'র্‌তে পার্‌লে, আমার ভাগ্য প্রসন্ন ব'ল্‌তে হবে। কিন্তু আমি মনে মনে এই স্থির ক'রেছি, সুকোমল, যে, আর আমি কারুরই ধর্ম্মপথের গুরু হবোনা। যে তার প্রিয় শিষ্যকে মনে মনে এক সময় চরিত্রহীন ব'লে সন্দেহ ক'রে ছিল, তার আর

যাই থাক্ না কেন, গুরুগিরি ক'র্‌বার ক্ষমতা বিলুপ্ত হ'য়েছে। শিপ্রা তোমার পাশেই র'য়েছে বাবা। ওকেই প্রশ্ন ক'র্‌লে সত্য-মিথ্যা জান্‌তে পার্‌বে। একদিন শরদিন্দুকে আমি সুরাসক্ত ব'লে সন্দেহ ক'রে ছিলুম। যে, শিষ্যের আসল রূপকে দীর্ঘকালের ঘনিষ্টতায়ও ঠিক্ মতো চিন্‌তে পারে না, তার নতুন শিষ্য করার ক্ষমতা আর নেই।

ইন্দ্রনাথের অকপট উক্তিতে কক্ষের তিনটি শ্রোতা ক্ষণকালের তরে নীরবে পরস্পরের মুখের উপর দিয়া স্ব-স্ব চক্ষুর দৃষ্টি বুলাইয়া লইল। শিপ্রা যারপর নাই কুণ্ঠিত এবং মর্ম্মাহত হইয়া মুখ নীচু করিয়া রহিল। তাহার আজি এই কথা মনের মধ্যে জাগরিত হইয়া উঠিল যে একদিন ইন্দ্রনাথকে সে ঐ সন্দেহের জন্য অপ্রিয় কথা শুনাইয়া দিয়া ছিল।

শরদিন্দু এতক্ষণ কোনো কথাই বলে নাই। সে এবার ইন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করিয়া সাতিশয় নম্রতার সহিত কহিল, সন্দেহ করা তো ধর্ম্মের এবং স্নেহের একটা ভিন্নরূপ গুরুদেব! আপনি ধার্ম্মিক, নির্ম্মল চরিত্রের সদাশয় ব্যক্তি। ধর্ম্মপথে যখন আমার বিচ্যুতি ঘট্‌লো, তখন আপনার মনে আমার প্রতি সন্দেহ আসাটা তো খুবই স্বাভাবিক। আপনি বিরাট আশ্রমের মাথা। বাংলায় এমন কোনো লোক নেই, যে আপনার অমরাবতী-আশ্রমের নাম না জানে; যে আপনার পাণ্ডিত্য, গুণাধিক্য মাথানত ক'রে স্বীকার না করে। যেখানে আপনার এতো সম্মান, এতো মর্য্যাদা সেখানে আমার মতো লোকের ওপর আপনার স্নেহ-সন্দেহ আসার জন্যে আপনার গৌরবের পথে

একটা কাঁটাও পড়েনি। আপনি আমাকে প্রাণের সঙ্গেই স্নেহ করেন, ভালোবাসেন ব'লেই তো সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠে ছিলেন। ভালোবাসায় সন্দেহ অন্তর্নিহিত থাকে। এই দেখুন না, গুরুদেব, —কবিরা চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাধারা ভালোবাসে। কেননা, তারা সন্দেহ করে—মেঘের আবরণকে। যে-আলো আমরা পেতে ভালোবাসি, তাকেই পরে আঁধারের সন্দেহের তলায় ফেলে ভীত হ'য়ে উঠি। বাপ্ ছেলেকে গভীরভাবে ভালোবাসে। অথচ সে সন্দেহ থেকে মুক্তি পায় না। কারণ, যতো দিন সন্দেহ থাকবে, ততো দিন ছেলেকে আরো ভালো ক'রে তোলবার ইচ্ছাও বলবতী থাকে।—ছেলের শিক্ষা এখনো ঠিক্ মতো হ'য়েছে কিনা জান্তে চাওয়াটাই তো সন্দেহ গুরুদেব! সেই সন্দেহের সহায়তায় যখন সে ছেলের অসম্পূর্ণতার সম্বন্ধে জাগ্রত হয়ে ওঠে, তখন তাকে আরো ভালো শিক্ষা দেবার মূলে তার যে আগ্রহ থাকে—সে তো ভালোবাসার সত্য-প্রতীক!

সকলেই বক্তার দীর্ঘ সমর্থন-বাক্যকে সম্মান প্রদর্শন করিল। কিন্তু ইন্দ্রনাথ যথাস্থানে বসিয়া পড়িয়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, তুমি আমায় যতোই সমর্থন করো না কেন শরো, আমি নিজের শক্তিকে বেশ বুঝি। তোমার সঙ্গে তর্ক আমি ক'র্‌বো না। ক'র্‌বো না এই জন্যে যে, তোমাকে সত্যই আমি ভালোবাসি, স্নেহ করি। তবু আজ তোমাদের বলে রাখ্‌ছি... বলিয়া তিনি সকলের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমাদের ব'লে রাখ্‌ছি—অমরাবতী আশ্রমের সমস্ত ভার জ্যোৎস্নাকে দিয়ে কল্পনার সঙ্গে তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়াবো। যে-কটা দিন

বাঁচ্‌বো, সে-কটা দিন আমায় দেখ্‌বার মতো ভক্তি কল্পনার আছে—সে আমি জানি। কিন্তু দুঃখ হয় বাবা সুকোমল, তোমার জন্যে। আমার কল্পনা মায়ের ভালোবাসা পেয়েও তুমি তাকে ঠিক্ সময়ে চিন্‌তে পারোনি। এখন তো আর সময় নেই, বাবা! সে-যে আমার বড়ো অভিমানী, বড়ো একরোখা মেয়ে।

এই বলিয়া ইন্দ্রনাথ বাঁ-হাতখানা পার্শ্বোপবিষ্ট শিপ্রার মাথায় রাখিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, শিপ্রা যখন শরদিন্দুর কাছে চ'লে এলো, তখন আমি নিজেকে বড়ো অসহায় মনে ক'রে নিয়ে ছিলুম। কিন্তু কল্পনা আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। এক সময়ে ভেবে ছিলুম—শিপ্রাকে চোখের আড়াল ক'র্‌লে আমি গতায়ু হবো। কিন্তু মরলুম না—কল্পনার সেবা-শুশ্রূষায় আমার মন প্রফুল্লিত হ'য়ে উঠ্‌লো। মনে মনে আমাব এই বিশ্বাস হ'লো—কল্পনা আর শিপ্রা আমার গত জন্মের পুণ্য-ফলে পাওয়া দুই মেয়ে। এবং আমি বিশ্বপিতার কাছে আজ তোমাদের সুমুখেই সর্ব্বান্তঃকরণেই প্রার্থনা ক'র্‌ছি—যেনো পর-জন্মে আবার কল্পনা ও শিপ্রাকে আমার নিজের দু'টি সু-সন্তান রূপেই পাই।

বলিয়া ইন্দ্রনাথ পরমেশ্বরের উদ্দেশে ভক্তিভরে যুক্তহস্ত ললাটে স্পর্শ করিলেন।

কথায় কথায় দিবসের বেলা পড়িয়া আসিল। ইন্দ্রনাথ অদ্যকার রাত্রের ট্রেণে রওনা হইবার কথা তুলিলেন, কিন্তু সুকোমলের সনির্ব্বন্ধানুরোধে সেরাত্রি যাওয়া স্থগিদ্ রহিল।

ইন্দ্রনাথ, শিপ্রা এবং শরদিন্দু—এই তিন জনে কলিকাতায়

রওনা হইবেন। দুপুরে শিয়ালদহ এক্সপ্রেস্ ধরিতে হইবে। সুতরাং সকলেই প্রস্তুত হইতে ছিলেন।

সুকোমল ঘোড়ার গাড়ী ডাকিয়া আনিল। কাল রাত্রি হইতে শীতটা একটু বেশী রকমই পড়িয়াছে। সুকোমল একখানা শাল আনিয়া শিপ্রার গায়ে ভালো করিয়া চাপা দিয়া দিল, সাশ্রুনয়নে কহিল, বোন্, অমঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যে-মঙ্গল, মধুর সম্পর্ক তোর সঙ্গে আমার অল্পদিনেই স্থাপিত হ'য়েছে, তাকে যেনো কখনো ভুলে যাস্‌নি! ভুলে যাস্‌নি যে, তোর এই হতভাগ্য দাদার তুই ছাড়া আর কেউ একফোঁটা চোখের জল ফেল্‌বার্ রইলো না।

শিপ্রার আয়ত চক্ষুর কোণে অশ্রু সঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে সুকোমলের পদদ্বয়ের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিল। তাহার পর তাহাতে নিজের মাথা স্পর্শ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবিকৃত কণ্ঠস্বরে বলিল, ভাই-বোনের সম্বন্ধ কি কেউ ভোলে, দাদা? এ যে শাশ্বত, এর তো ধ্বংস নেই!

সুকোমল ইন্দ্রনাথের পদধূলি নীরবে মাথায় হইল। শরদিন্দুর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া কহিল, তোমাদের রওনার সময় হ'য়ে এলো। আর আমি সময় নষ্ট ক'র্‌বো না। এই বলিয়া সে এক মুহূর্ত্ত চুপ্ করিয়া থাকিয়া কহিল, তোমার চেয়ে আমার বয়স বেশী, অভিজ্ঞতাও অল্প নয়। আজ যাকে তোমার সঙ্গের সবদিকের সাথীরূপে পেলে, তার সঙ্গের দাম অনেক। তাকে ক্ষণিকের তরেও বিস্মৃত হ'য়ো না। আমার আর কিছু বল্‌বার নেই।

তিনজনে উঠিয়া গাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল। সুকোমল তাহাদের ট্রেণে তুলিয়া দিতে গাড়ীর ছাদে উঠিয়া বসিতে যাইতে ছিল, ইন্দ্রনাথ জানিতে পারিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া নিজের পার্শ্বে বসাইয়া দিলেন।

ঘোড়ার অস্থিচর্ম্মসার পিঠের উপর কোচ্‌ম্যানের চাবুক্ সশব্দে পড়িতেই গাড়ী ছুটিল।

—উনিশ—

ট্রেণে তুলিয়া দিয়া সুকোমল যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, তখন বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে। বাহিরের ঘরে তক্তাপোষ-খানার উপর সে চিৎ হইয়া শুইয়া, কাঁধের আলোয়ানটা লম্ববান দেহের উপর টানিয়া লইল। চক্ষু বুজিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু বহুক্ষণ গত হইলেও যখন তাহার তিল মাত্রও তন্দ্রার ভাব আসিল না, তখন, সে উঠিয়া বসিল।

সম্মুখের কাঁচের আল্‌মারীর কাফ্ বোর্ডের ভিতর জনিওয়াকার ও ডেওয়ার্স হুইস্‌কির দুই, তিনটা নূতন বোতল অবস্থান করিতে ছিল। সুকোমল আল্‌মারীর দিকে চাহিয়া উত্তেজনায় উঠিয়া মেঝেতে দাঁড়াইল। তাহার পর চাবি খুলিয়া একটা বোতল হাতে তুলিয়া লইতেই তাহার স্মরণ হইল, শিপ্রা ষ্টেশনে তাহাকে গোপনে ডাকিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে চুপি চুপি কহিয়া ছিল, দাদা, একদিন তুমি আমাকে অবলম্বন ক'রে মদ ছাড়্‌তে চেয়ে ছিলে। তোমাকে আমি কোনো দিন খেতে দেখিনি। কিন্তু তবু তোমার কাছে আমার একটা মিনতি দাদা, তোমার ওপর আমার অখণ্ডনীয় বিশ্বাস জেনে, ওই জিনিষটাকে আর প্রশ্রয় দিও না।

সুকোমল পথের দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দুই চক্ষু পুরিয়া অশ্রু টল্-টল্ করিতেছে। ভাবিল,

তাহার এতোদিনের সুরাপানের অভ্যাসে কেহ তো একবারও তাহাকে বাধা দেয় নাই ওই জিনিষটা আর খাইও না বলিয়া! শিপ্রা সত্যই তাহাকে ভক্তি করে, ভালোবাসে। নতুবা সে তাহাকে বিশ্রী স্বভাব হইতে বিরত হইবার জন্য কাতর মিনতি জ্ঞাপন করিয়া চক্ষুর অশ্রু মোচন করিত না।

সুকোমল দৃষ্টি ফিরাইয়া হাতের বোতলটার দিকে চাহিল। চোখ্ তাহার জলে ঝাপ্সা হইয়া, আসিয়া ছিল। চোখ্ বুজিয়া আবার চাহিল। তাহার পর সহসা উন্মত্তের ন্যায় হাতের বোতলটা বাহিরের পথের উপর নিক্ষেপ করিল। বোতল ভাঙ্গিতেই চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল—ইহার মধ্যস্থিত উগ্র গন্ধের তরল পদার্থ।

দ্বিতীয় বোতলটারও ঐরূপ শোচনীয় অবস্থা করিয়া সুকোমল বিড়্-বিড়্ করিয়া আপন মনে কি সব বলিতে লাগিল। তাহার পর সে একটা ছবির এ্যাল্বাম্ আল্মারীর তাকের কোণ হইতে নামাইয়া তক্তাপোষের উপর ছুঁড়িয়া ফেলিল এবং নিজে এক পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া এ্যাল্ব্যামের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল—কল্পনার একখানা প্রতিকৃতির উপর। ইহা কল্পনার কলেজে অধ্যয়ন-সময়ের ফটো। একখানা বই হাতে করিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে। সমুদ্রের কোলে সূর্য্যদেবের অস্ত যাওয়ার সুমধুর দৃশ্য ছবিখানার ব্যাক্-গ্রাউণ্ড করিয়া লওয়া হইয়াছে। কল্পনার এই ছবির ভিতর যেনো একটা জীবন্ত মানুষের জ্যোতি এবং রূপ বাহিরে ঠিক্রাই পড়িতে ছিল। সুকোমল ছবির দিকে নিবিষ্ট চিত্তে চাহিয়া রহিল।

এমনি বহুক্ষণ গত হইয়া গেল। রাজ্যের চিন্তা আসিয়া সুকোমলের মনে বাসা বাঁধিয়া বসিয়াছে। ভৃত্যের ডাকে তাহার হুঁস্ হইল। ঘাড় ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিতে গিয়া দেখিল—টেবিলটার উপর ধূমায়িত এক পেয়ালা চা', এবং কাঁচের প্লেটে গোটা দুই ডিমের পোচ্।

ঘড়িটার পানে চাহিয়া সুকোমল দেখিল,—বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। চায়ের পেয়ালাটা নিঃশব্দে হাতে তুলিয়া লইল।

সপ্তাহকাল পরে সুকোমলের মন কলিকাতায় যাইবার জন্ম অস্থির হইয়া উঠিল। শরদিন্দুর বাড়ীর ঠিকানা সে ষ্টেশনেই জানিয়া লইয়াছে। মনে মনে স্থির করিল—ঐখানে যাইয়া সে উঠিবে। তাহার পর তাহাকে লইয়া একবার অমরাবতী-আশ্রমে গিয়া কল্পনাকে দুই চক্ষু ভরিয়া কিছুক্ষণ দেখিয়া নিজের চিত্ত হাল্কা করিয়া লইবে।